আবদুল হকের ঐতিহাসিক চরিতনাটক *ফেরদৌসী*

মেহের নিগার[*]

সারসংক্ষেপ : সাতচল্লিশ-উত্তর নাট্যকার হিসেবে প্রাবন্ধিক আবদুল হকের ভূমিকা স্বল্পালোচিত প্রসঙ্গ। অথচ বাংলা নাটকের গঠনমূলক পর্বে বিষয়বস্তু-নির্বাচন এবং আঙ্গিক-পরিচর্যায় তাঁর কর্মপরিধি ও নাট্যকুশলতা নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য সংযোজন। নাট্যাঙ্গিকের নিরীক্ষায় আগ্রহী আবদুল হক-এর ঐতিহাসিক চরিতনাটক *ফেরদৌসী* (১৯৬৪) তাঁর দীর্ঘপঠন ও গবেষণাঋদ্ধ প্রয়াস। প্রচলিত জন-রুচির বাইরে গিয়ে, সাহিত্যমূল্য-সম্পন্ন মঞ্চোপযোগী নাটক রচনায় আগ্রহ ছিল তাঁর। সেই সূত্রেই তাঁর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ও ভিন্ন মানদণ্ডের নাট্যপ্রয়াস, পূর্ণাঙ্গ ঐতিহাসিক চরিতনাটক *ফেরদৌসীর* নাট্যগুণ বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে আবদুল হকের নাট্যকৃতির স্বাতন্ত্র্য নির্দেশ বর্তমান প্রবন্ধের মূল প্রতিপাদ্য।

ভূমিকা

বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের অন্যতম ব্যক্তিত্ব আবদুল হক (১৯১৮-১৯৯৭)-এর মননশীল প্রাবন্ধিক পরিচয়ের অন্তরালে ঢাকা পড়ে আছে নাট্যকার হিসেবে তাঁর উল্লেখযোগ্য ভূমিকা। চিন্তাবিদ হিসেবে, এ অঞ্চলের মানুষের রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক চেতনাজগতে গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশনা প্রদান ছাড়াও, সাতচল্লিশ পরবর্তী আধুনিক বাংলা নাটকের অনুশীলনপর্বে নাট্যকার হিসেবে তাঁর রয়েছে বহুমাত্রিক অবদান।[১] বিষয়-নির্বাচন ও প্রাকরণিক বৈচিত্র্যে তাঁর নাট্যসম্ভার আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচায়ক। প্রবন্ধ-সাহিত্যের মতোই তাঁর নাটকেও প্রাধান্য পেয়েছে দেশ, জাতি, সময় ও সমাজের অনুসন্ধিৎসু চিত্রের প্রতিফলন। তবে রীতির দিক থেকে তিনি বৈচিত্র্যপ্রিয় ও নিরীক্ষাধর্মী। একদিকে সামাজিক সংকটের নানাবিধ অনুষঙ্গ তুলে ধরেছেন বাস্তববাদী ধারায়; অন্যদিকে কোনো কোনো নাটকে রূপক-সংকেত-প্রতীকের সুচিন্তিত ব্যবহারে সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অবক্ষয়ের জটিল চিত্র তুলে ধরেছেন তিনি। ঐতিহাসিক বিষয়কেন্দ্রিক ধ্রুপদীরীতি এবং কাব্যনাট্যের ধারাতেও তাঁর সাবলীল বিচরণের সাক্ষ্য মেলে। বর্তমান প্রবন্ধটির বিষয় ঐতিহাসিক চরিতনাটক হিসেবে, তাঁর দ্বিতীয় পূর্ণাঙ্গ নাটক : *ফেরদৌসী*র (১৩৭১/১৯৬৪) মূল্যায়ন। ১৯৫৮ সালে রচিত হলেও নাটকটি ১৯৬১-৬২ সালে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল মাসিক সওগাত পত্রিকায় (আবদুল, ১৯৭৫ : ভূমিকাংশ-চ)। বাংলা ১৩৭১ সালে বাংলা একাডেমি থেকে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত এই নাটকটি ১৯৬৩ সনে নাট্য-প্রতিযোগিতায় বাংলা একাডেমি ও জাতীয় পুনর্গঠন ব্যুরো কর্তৃক পুরস্কৃত হয় (আবদুল, ১৯৭৫ : দ্বিতীয় সংস্করণের কথা-ঘ.)। একই সাথে এই সম্মাননা পান সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ (১৯২২-১৯৭১) ও সিকান্দার আবু জাফর (১৯১৯-১৯৭৫) যথাক্রমে তাঁদের নাটক *তরঙ্গ-ভঙ্গ* (১৯৬৫) ও *সিরাজউদ্দৌলা* (১৯৬৫)-এর জন্য। প্রাগুক্ত নাট্যকারদ্বয় ও তাঁদের দুটি নাটক, শিল্প-সমালোচনার ক্ষেত্রে যথাযথ মনোযোগ পেলেও, আবদুল হক-এর নাট্যকর্মটির গুরুত্ব এখন অবধি রয়ে গেছে স্বল্পালোচিত। এই বিবেচনা থেকেই ইতিহাস-নির্ভর চরিতনাটক হিসেবে *ফেরদৌসী* রচনায় আবদুল হকের শিল্পকৃতির স্বাতন্ত্র্য বিশ্লেষণ-ই বর্তমান প্রবন্ধের মূল প্রতিপাদ্য।

বাংলা ঐতিহাসিক নাটক : পটভূমি

বাংলা সাহিত্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ ও জনপ্রিয় ধারা ‘ঐতিহাসিক নাটক’। আধুনিক বাংলা নাট্যরূপের বিকাশের সূচনালগ্ন থেকে অন্যতম পাঠক-দর্শকপ্রিয় এই ধারাটি উনিশ এবং বিশ শতক জুড়েই গুরুত্বের সাথে চর্চিত হয়ে এসেছে। একবিংশ শতাব্দীতে এসে নাগরিক পাঠক-সমাজ ও মঞ্চ-সংস্কৃতিতে এটি মূলধারার নাটক হিসেবে পূর্বের প্রাধান্য হারালেও, গ্রামভিত্তিক নাট্যপালা ও যাত্রায় ঐতিহাসিক নাটক এখনও শক্তিশালী অবস্থানেই আসীন। ঐতিহাসিক নাটকের সংজ্ঞার্থ প্রসঙ্গে দুর্গাশঙ্কর মুখোপাধ্যায় বলেন, “যে-নাটকের মূল কাহিনী, প্রধান প্রধান ঘটনা ও চরিত্রগুলি ইতিহাস থেকে গৃহীত এবং নাট্যকারের সৃজনশীল পরিকল্পনার সহযোগে যা মানবিকগুণে মণ্ডিত হয়ে শিল্পমূল্যে রসোত্তীর্ণ তাই হল ঐতিহাসিক নাটক” (দুর্গাশংকর, ২০০৩ : ২৪২)। পাঠক-প্রত্যাশানুযায়ী এই শ্রেণির নাটকে, নাট্যকারকে বিশেষভাবে মনোযোগ দিতে হয় ঐতিহাসিক সত্যের সীমা লঙ্ঘন না করে, বিধৃত যুগের ‘সুর ও মেজাজকে’ যথাযথভাবে তুলে ধরার বিষয়ে এবং সেটি করতে গিয়ে সেই সময় ও যুগ-আবহকে জীবন্ত করে তুলতে হয় যথোপযুক্ত ঐতিহাসিক চরিত্র ও ঘটনাবলির অন্তর্ভুক্তিকরণ সংশ্লিষ্ট জীবনাচার, ভাষা ও সংস্কৃতি, সামাজিক প্রথা ও রীতিনীতি- প্রভৃতির সুদক্ষ প্রয়োগ সহযোগে। (দুর্গাশংকর, ২০০৩ : ২৪২)

মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-১৮৭৩), জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪৯-১৯২৫), গিরিশচন্দ্র ঘোষ (১৮৪৪-১৯১২), দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (১৮৬৩-১৯১৩), ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ (১৮৬৩-১৯২৭), শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত (১৮৯২-১৯৬১), মন্মথ রায় (১৮৯৯-১৯৮৮) প্রমুখের হাতে সুদীর্ঘ উত্তরাধিকারের ঐতিহাসিক নাট্যধারার প্রথম পর্বের মানোত্তীর্ণ নাটকের যাত্রা শুরু। পরাধীন ঔপনিবেশিক বাস্তবতায় এ ধারার নেপথ্যে সর্বাধিক কার্যকর ছিল প্রবল দেশপ্রেম, জাতীয়তাবাদী উদ্দীপনা, ভাবাবেগপূর্ণ বীরত্ব ও সংগ্রামী চেতনার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব। এ প্রসঙ্গে ‘বাংলাদেশের পঁচিশ বছরের নাট্য সাহিত্যের ধারা (১৯৭১-১৯৯৫)’ প্রবন্ধে ড. বিশ্বজিৎ ঘোষ, ‘দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সমাপ্তি পর্যন্ত কালখণ্ডে’, বাংলা নাটক বিকাশের যে চারটি প্রধান প্রবণতাভিত্তিক নাট্যধারাকে সনাক্ত করেছেন, তার মধ্যেও প্রথমটি হচ্ছে : ‘জাতীয়তাবাদ (কখনো

---

[*] সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

আবার তা সংকীর্ণ সম্প্রদায়-চেতনাশ্রয়ী) উন্মেষের জন্য ইতিহাস-ঐতিহ্য-পুরাণ মন্থন করে রচিত নাটক' (রামেন্দু, ২০১৩ : ৩০১-৩০২)। এই কালপর্বের উল্লেখযোগ্য নাটকের মধ্যে রয়েছে মাইকেল মধুসূদন দত্ত-এর *কৃষ্ণকুমারী* (১৮৬১), জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর-এর *পুরুবিক্রম* (১৮৭৪), গিরিশচন্দ্র ঘোষ-এর *সিরাজদ্দৌলা* (১৯০৬), দ্বিজেন্দ্রলাল রায়-এর *সাজাহান* (১৯০৯), শাহাদৎ হোসেন (১৮৯৩-১৯৫৩)-এর *সরফরাজ খাঁ* (১৯১৯), ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ-এর *আলমগীর* (১৯২১), ইব্রাহিম খাঁ (১৮৯৪-১৯৭৮)-এর *কামালপাশা* (১৯২৭), যোগেশচন্দ্র চৌধুরী (১৮৮৬-১৯৪১)-এর *দিগ্বিজয়ী* (১৯২৮), মন্মথ রায়ের *অশোক* (১৯৩৩), শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত'র *সিরাজদ্দৌলা* (১৯৩৮) প্রভৃতি।

সাতচল্লিশ-পরবর্তী কালপর্বে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক বাস্তবতায় কিছু ধর্মভিত্তিক এবং মুসলিম ব্যক্তিত্বনির্ভর নাটকের পাশাপাশি রচিত হয় ইতিহাসের নানামাত্রিক প্রেক্ষাপট ভিত্তিক নাটক। যেমন: ইব্রাহীম খলিল (১৯১৬-১৯৭৪)-এর *স্পেন বিজয়ী মুসা* (১৯৪৯), আকবর উদ্দিন (১৮৯৫-১৯৭৮)-এর *নাদির শাহ* (১৯৫৩), আসকার ইবনে শাইখ (১৯২৫-২০০৯)-এর *অগ্নিগিরি* (১৯৫৭), *তিতুমীর* (১৯৫৭); সিকান্দার আবু জাফর-এর *মহাকবি আলাওল* (১৯৬৬), শওকত ওসমান (১৯১৭-১৯৯৮)-এর *ক্রীতদাসের হাসি* (১৯৬৮) প্রভৃতি। বাংলাদেশের পাশাপাশি এই পর্বে বিশেষভাবে উল্লেখ্য পশ্চিমবাংলার আরও একজন শক্তিমান নাট্যকার উৎপল দত্ত (১৯২৯-১৯৯৩) যিনি 'স্বল্পায়তন ও পূর্ণাঙ্গ নাটকে ইতিহাসকে সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করেছেন' (সত্যবতী ও সমরেশ, ১৯৯৭ : ৬৫৮) শিল্পিত মর্যাদায়। তাঁর রচিত *অঙ্গার* (১৯৫৯), *ফেরারী ফৌজ* (১৯৬১), *টিনের তলোয়ার* (১৯৭১) প্রভৃতি নাটক বাঙালির নাট্যাভিজ্ঞতায় ইতিহাস ও রাজনীতির নতুন পাঠরীতি সংযোজন করতে সক্ষম হয়।

লক্ষণীয়, সাতচল্লিশ-উত্তর পূর্বপাকিস্তান এবং একাত্তর-পরবর্তী বাংলাদেশের নাট্যসংস্কৃতিতে ক্রমশ একটি বিশেষ দিক স্পষ্ট হয়ে ওঠে: ঐতিহাসিক পটভূমিতে, সুপরিচিত কোনো বিষয় বা ব্যক্তিত্ব-কেন্দ্রিক নাটক রচিত হলেও, শুধুই ধর্মীয় সংকীর্ণতা কিংবা রাজ্-রাজড়ার প্রতিপত্তির কাহিনির ভেতরে আর সীমাবদ্ধ না থাকা। ঐতিহ্যের মাত্রাহীন স্তুতি নয়, ইতিহাসের অন্ধ অনুকরণ নয়, কল্পনার লাগামহীন অপ্রাসঙ্গিকতা নয়, বরং সর্বজনস্বীকৃত ইতিহাসের সত্যকে উপেক্ষা না করে, সময়ের নির্যাস ও ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বের মানবিক অনুষঙ্গকে ফুটিয়ে তোলাই হয়ে ওঠে এই সময়ের ঐতিহাসিক নাটকের চল। এর প্রকৃষ্টতম উদাহরণ মুনীর চৌধুরী (১৯২৫-১৯৭১) রচিত *রক্তাক্ত প্রান্তর* (১৯৫৯)। পানিপথের রক্তপ্লাবিত যুদ্ধক্ষেত্রের পটভূমিতে, ইতিহাসের পাতা থেকে উঠে আসা চরিত্রদের, ইতিহাসের তথ্যের নিগড়ে আবদ্ধ করেন নি নাট্যকার। বরং ইতিহাসের প্রস্তাবিত বাস্তবতায় প্রোথিত চরিত্রাবলির বিশ্বাসযোগ্য ও শিল্পিত মানবীয় রূপায়ণ, এসব নাটকের সাহিত্যমূল্য বাড়িয়েছে বহুগুণ। আবদুল হক সাতচল্লিশ-উত্তর কালের নাট্যকার বিধায়, তাঁর রচিত বিস্তীর্ণ ও সঘন ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে *ফেরদৌসী* নাটকটির পরিকল্পনাও সমধর্মী শিল্পভাবনার অনুসারী।

ঐতিহাসিক চরিতনাটক

ঐতিহাসিক নাটকেরই আরও একটি প্রকরণ ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ কোনো ব্যক্তিত্বের জীবনভিত্তিক নাট্যাখ্যান, যাকে বলা হয়ে থাকে 'চরিতনাটক' বা 'জীবনীনাটক'। সংজ্ঞার্থ ও বৈশিষ্ট্য বিচারে বলা যায়, কোনো বিশিষ্ট মহৎ ব্যক্তির ঘটনাবহুল জীবনের উল্লেখযোগ্য দিক বা কর্ম অবলম্বনে রচিত যে নাটক তাই জীবনী নাটক (দুর্গাশংকর, ২০০৩ : ২৫১-৫২)। যেহেতু জীবনের ব্যাপ্তি সুবৃহৎ, তাই এই জাতীয় নাটক আদ্যপান্ত জীবনীভিত্তিক হতে পারে না। নাটকটির কেন্দ্রে থাকে মহৎ-ব্যক্তিটির জীবনের একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যা তার জীবনের মতাদর্শ, সংগ্রাম, স্বপ্ন, বিশ্বাস, সাফল্য-ব্যর্থতা, জয়-পরাজয়কে প্রতিফলিত করে। সমালোচকের অভিমত অনুসারে, ঐতিহাসিক চরিতনাটকে নাট্যকার, 'সমগ্র নাটকের মধ্যে সেই সব ঘটনাগুলিকেই মাত্র নির্বাচন করবেন যেগুলি সেই মূল ঘটনার পরিপোষক' (দুর্গাশংকর, ২০০৩ : ২৫১-৫২)। ফলে এ-জাতীয় নাটকে প্রচলিত ঘটনা-ঐক্যের পরিবর্তে, গুরুত্ব পায় প্রাসঙ্গিক ঘটনাসমূহের ঐক্য অথবা নায়ক-ঐক্য। অনেক ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক চরিত নাটকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হয়ে থাকে নায়ক-ঐক্য, কেননা ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ কোনও ব্যক্তির জীবনে উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলি ও নির্বাচিত প্রসঙ্গকে সংগ্রথিত করেই নির্মিত হয়ে থাকে এর নাট্যাখ্যান। ফলে প্রথাগত স্থান-কাল-ঘটনা-ঐক্যের বদলে গুরুত্ব পায় বিশেষ চরিত্রটিকে কেন্দ্র করে প্রাসঙ্গিক ঘটনানির্ভর জটিলতর ঐক্য (দুর্গাশংকর, ২০০৩ :২৫৩)। আলোচ্যমান নাটকেও এই সূত্রটি অনুসৃত হয়েছে।

এ ধারার নাটকে বিশেষ সতর্কতার বিষয়গুলির মধ্যে রয়েছে : প্রধান ঐতিহাসিক ঘটনাগুলির গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ও চরিত্রদের যে অংশটি ইতিহাস-স্বীকৃত, সেখানে তথ্যের প্রমাদ না ঘটানো এবং কাহিনির প্রয়োজনে অনৈতিহাসিক চরিত্র বা ঘটনা এলেও তাদের ওই বিশেষ ঐতিহাসিক সময়ের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ রাখা (সৌমিত্র, ২০০৬ : ৬৫৪)। এছাড়াও ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বকে বাস্তবোচিত করে তুলতে সেই কালোপযোগী স্বতন্ত্র সমৃদ্ধ ভাষা ও ইতিহাসভিত্তিক নাট্য-আবহকে নির্মাণ করতে হয় বিশ্বাসযোগ্য প্রেক্ষাপটে। বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল, ১৮৯৯-১৯৭৯) রচিত *শ্রীমধুসূদন* (১৯৩৯), *বিদ্যাসাগর* (১৯৪২), নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় (১৯১৮-১৯৭০) রচিত *রামমোহন* (১৯৫৪) ইত্যাদি নাটক এই শ্রেণির অন্তর্গত। এর মধ্যে *শ্রীমধুসূদন* নাটকে জীবনের বহুবিধ ঘটনাবলির নিরিখে নাট্যকার বনফুল, কবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের শেষ জীবনের করুণ পরিণতিকে ও *বিদ্যাসাগর* নাটকে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বিধবা-বিবাহ কেন্দ্রিক সামাজিক সংগ্রামের ঘটনাকে মুখ্য-বিষয় হিসেবে গ্রহণ করেছেন (দুর্গাশংকর, ২০০৩ : ২৫২-২৫৩)। উল্লেখ্য, প্রাগুক্ত দুটি নাটকই সমালোচকের অভিমতে, 'আধুনিক জীবনী-নাটকের পথ-প্রদর্শক' (অজিতকুমার, ১৯৯৯ : ৩৮৪)

হিসেবে বিবেচিত। আমাদের আলোচ্যমান নাটক পারস্যের শ্রেষ্ঠ মহাকবি, মহাকাব্য *শাহনামা*র রচয়িতা প্রতিভাধর ফেরদৌসীর জীবনের শেষ সংগ্রামী অধ্যায়কে কেন্দ্র করে রচিত। সেদিক থেকে বিষয়-উপস্থাপন ও প্রাকরণিক বিবেচনায় *ফেরদৌসী* নাটকটি এই উপধারারই সমগোত্রীয় ও উত্তরসূরি।

ঐতিহাসিক সূত্র

ইরানের মহাকবি হাকিম আবুল কাসেম ফেরদৌসী (আনু. ৩২৯ হি./৯৪০ খ্রি.- ৪১১ হি./১০২০ খ্রি.) আনুমানিক ৯৭৭-১০১০ খ্রি. কালপর্বে রচনা করেন পারস্যের কালোত্তীর্ণ বীরগাথা *শাহনামে* বা *শাহনামা*। নিযামী আরুযীর (জ. আনু. ৬ষ্ঠ হি./১১ খ্রি.) *তাযকেরায়ে চাহার মাকালে* (১১৫৫ খ্রি.) শীর্ষক গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক গ্রন্থের তথ্যসূত্রে জানা যায়, এই মহাকবি, ইরানের তুস-এর অন্তর্গত তাবরান এলাকার বায্ গ্রামে জন্মলাভ করেন। (ব্রাউন, ১৯০৬ : ১৩২) দীর্ঘ একনিষ্ঠ সাধনায় প্রায় তিন দশকের অধিককাল ধরে পারস্যের জাতীয় অতীত মহত্ত্বের গাথা সংগ্রহ করে তিনি আনুমানিক ৪০১-০২ হিজরিতে সমাপ্ত করেন তাঁর এই অমর সৃষ্টি। আবু মনসুর দাকিকীর (৯৭৭ খ্রি./৩৬৭ হি.) হাজারখানেক পঙক্তি বিশিষ্ট রচনাকে বীজসূত্র[২] হিসাবে বেছে নিয়ে, তিনি রচনা করেন ৬২টি আখ্যান, ৯৯০টি অধ্যায় এবং ষাট হাজার বেইত বা শ্লোক বিশিষ্ট হামাসে[৩] বা বীরত্বগাথার এক জাতীয় মহাকাব্য। বাংলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত *শাহনামার* (২০১২) প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় শামসুজ্জামান খান মহাকাব্যটির গুরুত্ব সম্পর্কে বলেন :

> ...এতে ইরানের প্রাচীন ইতিহাসের একটি অনুপুঙ্খ কাব্যিক পুনর্নির্মাণই ছিল কবির অভীষ্ট লক্ষ্য।... শাহনামার ইতিহাস পৃথিবীর সৃষ্টি থেকে শুরু করে সপ্তম শতাব্দীতে পারস্যে ইসলামের বিজয় পর্যন্ত সম্প্রসারিত।...শাহনামা ইরানের জাতিতাত্ত্বিক, সাংস্কৃতিক আত্মপরিচয় এবং ইতিহাসের কালক্রমিক অভিযাত্রায় তুর্ক-মুঘলসহ সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের জাতি-পরিচয়কে ধারণ করেছে। এ বিবেচনায় এটি বহু-সংস্কৃতিকে আত্মস্থ করা এক বিশ্ব-মহাকাব্যেরই অন্তর্ভুক্ত। (মনিরউদ্দিন, ২০১২ : শামসুজ্জামান খানের ভূমিকাংশ দ্র.)

ঐতিহাসিক সূত্রে জানা যায় ফেরদৌসী *শাহনামা* রচনা শেষে নিদারুণ অর্থকষ্টে পতিত হয়ে বার্ধক্যে উপনীত হন। জীবনী চরিতকারদের রচনা অনুযায়ী, এই অবস্থায়, ‘ফেরদৌসী তাঁর কাব্যগ্রন্থটি একজন বাদশাহর রাজদরবারে উপস্থাপন করার উদ্যোগ নেন।... সেই বাদশাহ ছিলেন সুলতান মাহমুদ গাযনাভী’ (তামীমদারী, ২০০৭ : ১৩০)। সুলতান মাহমুদের ফরমায়েশে কাব্যটি রচিত না হলেও, তিনি ছিলেন কবির পৃষ্ঠপোষকদের অন্যতম। বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক, গবেষক ও *শাহনামার* বাংলা অনুবাদক মনিরউদ্দিন ইউসুফ (১৯১৯-১৯৮৭)-এর উল্লেখে জানা যায়, ‘কেবল প্রবীণ বয়সেই সুলতান মাহমুদের উজির হাসান মৈমুন্দীর সহায়তায় কবি গজনীর রাজসভায় গৃহীত হন,’ (মনিরউদ্দিন, ২০১২ : ভূমিকা পৃ.৩) যার স্মারক হিসেবে কাব্যের বহু স্থানেই সুলতানের প্রশংসা কীর্তিত হয়েছে। তিনি আরও উল্লেখ করেন, এত দীর্ঘ সাধনার ফসল রচনা শেষে ‘সুলতানের রাজসভায় একজন বিশিষ্ট কবিরূপে ফেরদৌসী মাহমুদের হাত থেকে প্রচুর পারিতোষিকের আশা করেছিলেন। কিন্তু আশানুরূপ পারিতোষিক তিনি পাননি।’ (মনিরউদ্দিন, ২০১২ : ভূমিকা পৃ.৩) তাঁর মতে, সুলতানের কাছ থেকে ফেরদৌসীর প্রত্যাশিত পারিশ্রমিক না পাওয়ার নেপথ্য কারণ- *শাহনামা* কাব্যের ‘বিষয়বস্তু’। তিনি বলেন, ‘‘শাহনামা’ ইরানীয় জাতীয়তার উজ্জীবনের কাব্য। ইরানের স্বাধীনতা হরণকারী তুর্কী বংশোদ্ভূত গজনী-রাজবংশ এ-কাব্য সন্তুষ্ট মনে গ্রহণ করতে পারে না।’ (মনিরউদ্দিন, ২০১২ : ভূমিকা পৃ.২)

বিশিষ্ট গবেষক ই. জি. ব্রাউন (১৮৬২-১৯২৬) তাঁর ফার্সি সাহিত্যের ইতিহাস বিষয়ক আকরগ্রন্থ *A Literary History of Persia* (১৯০৬)-এ গজনীর সুলতান ও তাঁর রাজসভার কবি ফেরদৌসীর দ্বন্দ্ব বিষয়ক একাধিক প্রচলিত ঐতিহাসিক ভাষ্য ও লোকশ্রুতি উপস্থাপন করেন।[৪] কথিত আছে দীর্ঘ শ্রম শেষে,ফেরদৌসী তাঁর *শাহনামা* কাব্যের একজন রসজ্ঞ ও সমঝদার পৃষ্ঠপোষকের সন্ধানে ছিলেন যাতে তাঁর একমাত্র কন্যার বিয়ের জন্য অর্থ সংগৃহীত হয় (ব্রাউন, ১৯০৬ : ১৩২)। অন্য একটি সূত্রে জানা যায় যে, কবি জনৈক মহান সভাসদের মধ্যস্থতায় গজনীর সুলতানের রাজদরবারে প্রবেশাধিকার লাভ করেন এবং *শাহনামা* পেশ করার সুযোগ পান (তামীমদারী, ২০০৭ : ১৩০-৩১)। কিন্তু সেই ব্যক্তির একাধিক শত্রু, তাঁর পদমর্যাদাকে ছোট করবার উদ্দেশ্যে, ফেরদৌসী ও তাঁর রচনার প্রতি তাচ্ছিল্য প্রদর্শন করে। নিযামী আরুযী’র বরাত দিয়ে অধ্যাপক ব্রাউন জানান, এই সভাসদ স্বয়ং মাহমুদের মন্ত্রী মায়মন্দী এবং তাঁর প্রতিপক্ষেরাই *শাহনামা*’র উদ্ধৃতি[৫] ব্যবহার করে সুলতানের দরবারে অভিযোগ আনে যে, ফেরদৌসী, ‘রাফেযী’[৬] (শিয়াপন্থি) এবং ‘মু’তাযেলী’[৭] (ব্রাউন, ১৯০৬ : ১৩৪)। নিযামী আরুযীর সূত্র অনুসারে, সুলতান অত্যন্ত ধর্মান্ধ ও গোঁড়াপন্থি হবার কারণে এই সব কুপ্ররোচনায় বিশেষ প্রভাবিত হন (ব্রাউন, ১৯০৬ : ১৩৫)। অপর একটি সূত্র, দৌলত শাহ-এর বিবরণ অনুযায়ী, ফেরদৌসীর অবহেলাজনিত আচরণে ক্ষিপ্ত হয়ে সুলতানের প্রিয়তম ও ঘনিষ্ঠ অমাত্য আয়াজই কবির বিরুদ্ধে সুলতানকে সর্বাধিক ইন্ধন যোগান (ব্রাউন, ১৯০৬ : ১৪০)। ফলে সুলতানের মত প্রভাবিত হয় এবং তিনি কবিকে কম পারিশ্রমিক প্রদান করেন।

তাযকেরায়ে চাহার মাকালের সূত্রে জানা যায়, *শাহনামা* বাবদ শেষপর্যন্ত ফেরদৌসীকে বিশ হাজার দিরহাম প্রদান করায় অসম্মানিত কবি এই অর্থ হাম্মামখানার কর্মচারী ও দরিদ্রদের মাঝে বণ্টন করে দেন (তামীমদারী, ২০০৭ : ১৩১)। সুলতানের উপঢৌকন প্রত্যাখ্যান করায় সুলতানের রোষ ও শাস্তির ভয়ে কবি গজনী থেকে হেরাতের দিকে রওনা হন এবং সেখান থেকে তুস-এ প্রত্যাবর্তন করেন (ব্রাউন, ১৯০৬ : ১৩৫)। *তাযকেরায়ে চাহার মাকালে* অনুযায়ী হেরাতে তিনি কবি আয্রাকির পিতা ইসমাইল নামে এক গ্রন্থ-বিক্রেতার কাছে আশ্রয় লাভ করেন এবং সেখানে ছয় মাস আত্মগোপন করে

থাকেন (ব্রাউন, ১৯০৬ : ১৩৫)। দৌলত শাহ-র *তাযকিরাতুশ শোয়ারার* বিবরণে অবশ্য এই গ্রন্থ-বিক্রেতার নাম আবুল মা'আলী হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। (ব্রাউন, ১৯০৬ : ১৪০)

কবি এরপর *শাহনামা* নিয়ে, মাযান্দারানে বাদশাহ শাহরিয়ার ইবনে শারভীন-এর কাছে চলে যান এবং সেখানেই আশাভঙ্গ কবি সুলতান মাহমুদ গাযনাভীর অন্যায়ের বিরুদ্ধে তাঁর প্রতিবাদ ও প্রবল ক্ষোভ একশোটি শ্লোকের একটি নিন্দাসূচক ব্যঙ্গ-কবিতায় বিধৃত করেন (তামীমদারী, ২০০৭ : ১৩১)। গুরুত্বপূর্ণ সব ঐতিহাসিক সূত্রই সুলতান মাহমুদকে নিয়ে ফেরদৌসী লিখিত অপবাদসূচক কবিতাটির ঐতিহাসিক সত্যতা নিশ্চিত করে, তবে কবিতাটির আয়তন, রচনাকাল ও পরিস্থিতি বিষয়ে মতভেদ রয়েছে।[৮] ব্রাউন উল্লিখিত সূত্র ইবন ইস্ফান্দিয়ারের *তারিক ই তাবারিস্তান*-এর বিবরণ অনুসারে, বাদশাহ শারভীন নানাভাবে কবিকে বোঝাতে সক্ষম হন যে *শাহনামা* একটি কালজয়ী-কাব্য এবং সম্ভবত সুলতানের অনুচরদের কারণে কবি ও তার মহাকাব্যের ভুল উপস্থাপন ঘটেছে সুলতানের কাছে। একসময় সুলতান তাঁকে ঠিকই মর্যাদা দেবেন এই আশ্বাসে এবং এক লক্ষ দিরহামের বিনিময়ে ফেরদৌসী নিজেরটিসহ সেই নিন্দাসূচক কবিতাটির সব অনুলিপি ফিরিয়ে দেন যা পুড়িয়ে নষ্ট করে ফেলা হয়। (ব্রাউন, ১৯০৬ : ১৩৫-১৩৬)

সুলতান মাহমুদ যে পরবর্তীকালে তার আচরণের জন্যে অনুতপ্ত হন, তাও ইতিহাসে উল্লেখ আছে। নিযামী আরুযীর রচনা অনুযায়ী, কথিত আছে, সুলতান মাহমুদ জনৈক মহামতি খাজার মুখে, ভাষ্যান্তরে মন্ত্রী মায়মন্দীর মুখে একটি কবিতা[৯] পাঠ শোনেন এবং প্রশ্ন করে জানতে পারেন এই পৌরুষদীপ্ত কবিতা ফেরদৌসীর, যিনি দীর্ঘ সময় ও শ্রম দিয়ে অমর কাব্য রচনা করেও সাফল্য ও স্বীকৃতি লাভ করেননি। এর প্রতিক্রিয়ায় সুলতান মাহমুদ বলেন, "আমি তার জন্য অনুতপ্ত। সেই স্বাধীনচেতা লোকটি আমার কাছ থেকে বঞ্চিত হয়েছে" (তামীমদারী, ২০০৭ :১৩১)। বস্তুত মায়মন্দীর কারণেই এই বিরোধের নিষ্পত্তি ঘটলেও এর পরিণতি হয় করুণ শ্লেষাত্মক। মাহমুদ কবিকে পুরস্কৃত করতে মনস্থির করেন, কিন্তু ততদিনে ফেরদৌসী জীবনের শেষ প্রান্তে। শেষাবধি সুলতান কবির প্রতি দুঃখ-প্রকাশসহ উপঢৌকন হিসেবে উটের পিঠে, ষাট হাজার দিনারের সমমূল্যের নীল (ইন্ডিগো) পাঠিয়েছিলেন (ব্রাউন, ১৯০৬ : ১৩৭-১৩৮)। কথিত আছে : "সে সময় তাবেরান শহরে এক দরওয়াজা দিয়ে সুলতান মাহমুদের উপঢৌকন প্রবেশ করছিল, অন্য দরওয়াজা দিয়ে ফেরদৌসীর কফিন বাইরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। এ ঘটনাটি দৃশ্যত ৪১১ হিজরি (১০২০ খ্রি.) সালে সংঘটিত হয়েছিল।" (তামীমদারী, ২০০৭ : ১৩২) এই তথ্যের সমর্থনে মনিরউদ্দিন ইউসুফ জানান 'ফেরদৌসী ১০২০ খ্রিষ্টাব্দে স্বীয় জন্মভূমি তূস নগরেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।' (মনিরউদ্দিন, ২০১২ : ভূমিকা পৃ. ১১)

ইতিহাসে লিপিবদ্ধ আছে, ফেরদৌসীর মৃত্যুর পর সেই শহরের একজন ধর্মীয় বক্তা, ফেরদৌসীকে 'রাফেযী' আখ্যা দিয়ে মুসলমানদের কবরস্থানে দাফন করতে প্রবল বাধা দেন, ফলে ফেরদৌসীকে নিজের বাগানেই অন্তিম শয়ানে সমাধিস্থ করা হয়। (ব্রাউন, ১৯০৬ : ১৩৮) এ ছাড়াও ইতিহাসে কবির পরিবার সম্পর্কে উল্লেখ রয়েছে যে, সম্ভবত ফেরদৌসীর একটি পুত্র সন্তান ছিল যে পিতার জীবদ্দশায় ৩৭ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করে (তামীমদারী, ২০০৭ : ১৩২) এবং আত্মসম্মানী ও উচ্চ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন "ফেরদৌসীর একটি মেয়ে জীবিত ছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর তিনি রাজকীয় উপঢৌকন গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানান" (তামীমদারী, ২০০৭ : ১৩২)। নানাবিধ-ভাষ্য থাকলেও লিপিবদ্ধ ইতিহাস ও ঐতিহাসিক শ্রুতির সমন্বয়ে প্রাপ্ত এসব তথ্যই আবদুল হকের *ফেরদৌসী* নাটকের প্রধান ইতিহাসসূত্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে ।

নাট্য অভিপ্রায়

১৯৫৭ সালের ২৯ ডিসেম্বর *ফেরদৌসী* সম্পর্কে আবদুল হকের দিনলিপিতে জানা যায়, পাঁচ বছরব্যাপী দীর্ঘ গবেষণা ও সংশোধনের প্রক্রিয়ায় তিনি চেষ্টা করেছেন একটি ভিন্ন মাত্রার নাটক লিখতে (সৈয়দ আজিজুল, ২০০৩ : ১২০)। এর সাথে যোগ হয়েছে 'পাঠক ও দর্শকদের প্রচলিত রুচিকে এবং প্রচলিত নাট্যরীতিকে উপেক্ষা' (আবদুল, ১৯৭৫ : ভূমিকাংশ. চ) করে মঞ্চোপযোগিতার পাশাপাশি সাহিত্যগুণসম্পন্ন নাটক-রচনা বিষয়ে তাঁর কেন্দ্রীয় অবস্থান (আবদুল, ১৯৭৫ : ভূমিকাংশ চ)। বাংলা ঐতিহাসিক নাটক জনপ্রিয় ধারার রচনা হলেও আবদুল হক প্রথাগতভাবে কোন মুসলিম নৃপতি বা সেনানায়ক নয়, বরং নায়ক হিসেবে নির্বাচন করেছেন বয়োবৃদ্ধ মহাকবিকে। শুধু তাই নয় ফেরদৌসীকে তিনি ক্ষমতাসীনের পীড়ন-দমনের বিপরীতে প্রতিস্পর্ধী, সাহসী, প্রখর আত্মসম্মানবোধসম্পন্ন কেন্দ্রীয় চরিত্র হিসেবে তুলে ধরেছেন : "... তাঁর জীবন তেমনি একজন তন্ময় কাব্য-সাধকের জীবন যাঁর মূল্য সমকালীন সমাজ বোঝে না, বুঝলেও খুব বিলম্বেই বোঝে। সমাজের স্বীকৃতি দেখে যাওয়ার ভাগ্যও হয়তো তাঁর হয় না" (আবদুল, ১৯৭৫ : ভূমিকাংশ ঙ)। ফেরদৌসীর এই অকুতোভয় ব্যক্তিত্ব ও প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে আপসহীন নিষ্ঠাবান শিল্পীর সংগ্রাম তাঁর চিন্তা ও কল্পনাকে উদ্দীপিত করেছে (আবদুল, ১৯৭৫ : ভূমিকাংশ ঙ)। প্রতিষ্ঠিত ইতিহাসের সূত্র অনুসরণ করেই যে পরিকল্পিত হয়েছে *ফেরদৌসীর* নাট্যাখ্যান, তার সমর্থনে নাটকটির প্রথম সংস্করণের ভূমিকাতেও রয়েছে আবদুল হক-এর স্পষ্ট অবস্থান : "ইতিহাস-নির্ভর আর সব নাটকের মতো এতেও কল্পনার পক্ষ-বিস্তার আছে, তবে ফেরদৌসী সম্বন্ধে যে-সব ঐতিহাসিক তথ্য জানা যায় তার মূল সূত্র ধরেই আমি অগ্রসর হয়েছি, এদিক-ওদিক বিশেষ করিনি" (আবদুল, ১৯৭৫ : ভূমিকাংশ ঙ)। ১৯৯১এ প্রকাশিত *শাহনামা* (প্রথম খণ্ড)র ভূমিকায় অনুবাদক মনিরউদ্দীন ইউসুফ ফেরদৌসীর তথ্যভিত্তিক শেষ জীবনের যে খণ্ডিত পরিচয় দিয়েছেন, তা বহুশ্রুত ইতিহাসেরই অংশ। ১৯৫৮তে আবদুল হকও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠিত উৎস-এর সহায়তায় আলোচ্যমান নাটকটি রচনা করেন, যা নাটকটির আখ্যান পরিকল্পনা এবং প্রাগুক্ত বিভিন্ন

ঐতিহাসিক সূত্রাবলির তথ্যভিত্তিক সাযুজ্যে লক্ষণীয়। এ প্রসঙ্গে স্মর্তব্য ২৭ জুন ১৯৬৩ তারিখে তাঁর লিখিত দিনলিপি: "...তাঁকে অবলম্বন করে কোনো রোমান্টিক নাটক লেখা আমার উদ্দেশ্য ছিল না। আমার উদ্দেশ্য ছিল, তাঁর সম্বন্ধে জ্ঞাত প্রামাণ্য তথ্যগুলোর সূত্র ধরে একটা ক্রনিকল প্লে, একটা ঐতিহাসিক ঘটনামূলক নাটক রচনা করা" (মাযহার, ২০০১ : ১৪৩)। রচনা-উত্তরকালে তাঁর এই শৈল্পিক অভিপ্রায়ের প্রায়োগিক দিকের মূল্যায়ন আমাদের পরবর্তী আলোচনার মূল বিশ্লেষ্য।

নাট্য বিশ্লেষণ

ঐতিহাসিক চরিতনাটকের শিল্পসিদ্ধির প্রধান পূর্বশর্ত : নাটকের মূল আখ্যানটি ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রকে অবলম্বন করে পরিকল্পিত হবে (দুর্গাশংকর, ২০১৩ : ২৪৩)। সেই শিল্পবিবেচনায় নাট্যকার আবদুল হক ইরানের মহাকবি ফেরদৌসীর প্রতিবাদী কবিসত্তা ও জীবনের সংগ্রামপূর্ণ শেষপর্বকে এই নাটকের কেন্দ্রীয় নাট্যাখ্যান হিসেবে নির্ধারণ করেছেন। আটটি দৃশ্যে বিভক্ত *ফেরদৌসী* নাটকের মূল কাহিনি আবর্তিত হয়েছে *শাহনামা* রচনা-উত্তরকালে সুলতান মাহমুদ ও কবি ফেরদৌসীর বিরোধকে কেন্দ্র করে। জাতীয় মহাকাব্য *শাহনামা* রচনার প্রাপ্য পারিশ্রমিক থেকে বঞ্চিত ফেরদৌসীর সুলতানের বিরুদ্ধে অসন্তোষ, বিদ্রোহ, প্রতিবাদী ফেরারি-জীবন ও শেষাবধি বিরোধের করুণ নিষ্পত্তি এই নাটকের কেন্দ্রীয় প্রতিপাদ্য। এ পর্বে, দৃশ্যগুলির পর্যায়ক্রমিক আলোচনা প্রসঙ্গে পর্যবেক্ষিত হবে ঐতিহাসিক নাটকের সূত্রানুসারে নাটকটির কাহিনি বিন্যাস, চরিত্রের বাস্তবায়ন এবং যুগ-আবহ নির্মাণে নাট্যকার আবদুল হকের শিল্পকৃতির মূল্যায়ন।

ফেরদৌসী নাটকের প্রথম দৃশ্য পরিকল্পনার নেপথ্যে রয়েছে ঐতিহাসিক স্থান ও কালের প্রেক্ষাপটে নাটকের প্রধান-অপ্রধান, ঐতিহাসিক ও অনৈতিহাসিক চরিত্রের প্রাসঙ্গিক উপস্থাপন ও সেইসূত্রে তাদের সংশ্লিষ্টতাকে কেন্দ্র করে মূল নাট্যদ্বন্দ্বের সূত্রপাত। শুরুতেই গজনীর সুলতানের পাঠাগারে নাটকের অন্যতম প্রধান ঐতিহাসিক দুটি চরিত্র সুলতান এবং উজির মায়মন্দীর আলাপনের ভেতর দিয়ে নাট্যকার, সুলতান মাহমুদের মূল চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য: রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আধিপত্যের উচ্চাভিলাষকে তুলে ধরেন। প্রথম দৃশ্যেই প্রৌঢ় কবি ফেরদৌসীর কাছে *শাহনামা* রচনা সম্পন্নের সংবাদ পেয়ে সুলতান অত্যন্ত আনন্দিত হন এবং কবিকে 'জাতীয় মহাকাব্য' গ্রন্থটির পারিশ্রমিক হিসেবে ষাট হাজার স্বর্ণ দিনার দেবার প্রতিশ্রুতি দেন। আশ্বস্ত কবি এবং গর্বিত সুলতানের মধ্যকার যে সম্পর্ককে নাট্যকার ওই মুহূর্তে তুলে ধরেন তা ইতিহাসসূত্রে সুলতানের দরবারে কবির সমাদৃত অবস্থানের সত্যতাকে সমর্থন করে। (মনসুর, ১৯৭৮ : ৩৫-৩৬)

কিন্তু সুলতানের দুই অমাত্য খোরাসানের আমীর হাজিব আলী এবং সুলতানের শ্যালক আয়াজ ক্লান্ত ও অন্যমনস্ক কবিকে তাদের বীরত্বকেন্দ্রিক কাসিদা[১০] রচনার আর্জি জানিয়ে বিফল হলে কবি তাদের অসন্তোষের শিকার হন। কবির মন্তব্য ও কাব্যাংশকে বিকৃত করে প্রথমে হাজিব আলী আয়াজকে এবং পরবর্তীকালে ক্রোধান্ধ আয়াজ মিথ্যাচারের মাধ্যমে সুলতানকে ফেরদৌসীর বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলে। ফলে আকস্মিকভাবে তাঁর জীবনে নেমে আসে প্রবল দুর্বিপাক। নাট্যকার আবদুল হক ফেরদৌসীর বিরুদ্ধে ইতিহাসে উল্লিখিত দরবারি অভিযোগগুলির অধিকাংশই অভিনব-কৌশলে তুলে ধরেন আয়াজ কর্তৃক সুলতানের কানভারি করবার দৃশ্যাংশে। সেখানে দেখা যায়, আয়াজ সুলতানের কাছে বিষয়টিকে আরও জটিল করে ফেলার উদ্দেশ্যে ফেরদৌসীকে মোতাজেলাপন্থি হিসেবে অভিহিত করে—

> মাহমুদ। লোকে আজকাল শাহানামার খুব সমালোচনা করছে বোধহয়?
> আয়াজ। কবে না করেছে, জাঁহাপনা? ... তারা বলে, শাহানামায় জাল রুস্তম সোহরাব ইস্ফেন্দিয়ার জামশেদ বাহরাম এইসব অমুসলিমকে অত উঁচু করে দেখানো হল —
> মাহমুদ। ইতিহাসে আর কিংবদন্তিতে উঁচুতে তাঁদের স্থান।
> আয়াজ। ... ওরা বলে, ইয়াজদেজর্দ পর্যন্ত এসে কবি থেমে গেলেন, মুসলিম আমল শাহানামায় জায়গা পেল না। ব্যাপারটা বেশ চোখে পড়বার মতো কিনা। (আবদুল, ১৯৭৫ : ১২-১৩)
>
> ... ...
>
> আয়াজ। ...কবির বিরুদ্ধে আমি আরও অভিযোগ শুনেছি। লোকে বলে, তিনি মোতাজেলাপন্থি। (আবদুল, ১৯৭৫ : ১৩)
>
> ... ...
>
> মাহমুদ। ...ফেরদৌসী যতই শক্তিশালী হোন, আমার দরবার মোতাজেলাবাদ প্রচারের জায়গা নয়। আর আমার দরবারে থেকে মুসলিম আমলকে অবহেলা? অথচ এই কাব্যের একেকটি বয়েতের জন্যে দেওয়া হবে একেকটি দিনার। (আবদুল, ১৯৭৫ : ১৩)

এই ষড়যন্ত্রের ফলে ফেরদৌসী সম্পূর্ণরূপে সুলতানের বিরাগ-ভাজন হয়ে পড়েন এবং আয়াজের প্ররোচনায় ক্ষুব্ধ সুলতান পূর্বমত বদলে ফেরদৌসীকে *শাহনামা* বাবদ ষাট হাজার স্বর্ণ দিনারের পরিবর্তে 'আপাতত' ষাট হাজার রৌপ্য দিরহাম প্রদানের হুকুম দেন, যা পরবর্তী নাট্য-জটিলতা ঘনীভূত হবার পেছনে প্রধান কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ব্রাউন উল্লিখিত দৌলত শাহ-র বিবরণ অনুযায়ী ঐতিহাসিক চরিত্র আয়ারে এই নেতিবাচক ভূমিকা ইতিহাসস্বীকৃত (ব্রাউন, ১৯০৬ : ১৪০)। এছাড়াও দৃশ্যের শেষে হিন্দুস্তান থেকে ফিরে ফেরদৌসীকে প্রাপ্য পারিতোষিক দেবার বিষয়ে সুলতানের পুনর্বিবেচনার আগ্রহের প্রসঙ্গটি আয়াজের কারণে উহ্য রয়ে যায়। এই দৃশ্যে ফেরদৌসীকে ঘিরে ঘনিয়ে ওঠা ষড়যন্ত্রের অধিকাংশ অনুষঙ্গই বিভিন্ন ইতিহাসসূত্রে প্রচলিত বয়ান হিসেবে অন্তর্ভুক্ত। নাট্যকার আবদুল হক এসব বিচ্ছিন্ন ঘটনার একটি দুরূহ সমন্বয় ঘটিয়ে আলোচ্যমান দৃশ্যটিকে নাটকের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক দৃশ্য হিসেবে নির্মাণ করেছেন। শেক্সপিয়রের নাটকে যেমন নাট্যিক-দ্বন্দ্ব পরিস্থিতি ও ব্যক্তির

হাতে সৃষ্টি হয়ে জটিলাকার ধারণ করে, সেই রকম একটি রীতি তাঁকেও প্রভাবিত করেছে বলে মনে হয়। *ওথেলো* (১৬০৩) নাটকে যেমন ইয়াগোর মিথ্যাচার ও শঠতায় প্ররোচিত হয়ে ওথেলো হত্যা করে দেসদিমোনাকে, তেমনি এখানেও এই অপ্রধান দুই চরিত্রের হীনমন্য আচরণের কারণে সুলতানের আক্রোশের শিকার হন মহাকবি ফেরদৌসী। এই দৃশ্যে নাট্যকার বয়স্ক ফেরদৌসীর আচরণ ও অন্যমনস্কতা, সুলতানের ক্ষোভ ও বীতরাগ, উভয়ের অজ্ঞাতসারতা এবং আমীরদ্বয়ের নীচতা ও প্রতিহিংসা-সবকিছুকেই মানবিক ও বিশ্বাসযোগ্যভাবে উপস্থাপন করে নাটকের গতিময়তাকে অক্ষুণ্ন রাখেন। পুরো নাটকে কবি ফেরদৌসী ও সুলতান মাহমুদের কাছে আমীর আয়াজ ও আমীর হাজিব আলীর ব্যক্তিগত ক্ষোভপ্রসূত প্ররোচনা ও ষড়যন্ত্র অজ্ঞাত থেকে যায় এবং এভাবেই নাট্যাখ্যানে নাট্যকার অপ্রধান চরিত্রের সম্পৃক্তির মাধ্যমে ফেরদৌসীর জীবনের ঐতিহাসিক বিপর্যয়ের সূচনা ঘটান।

দ্বিতীয় দৃশ্যের প্রয়োগ-ভাবনাতেও রয়েছে নাট্যকারের নাট্যবীজ বিস্তারের শৈল্পিক অভিপ্রায় এবং ঐতিহাসিক কাহিনি অনুসরণের সচেতন প্রয়াস। *চাহারে মাকালে* গ্রন্থে বর্ণিত ঘটনাক্রমের সঙ্গে দ্বিতীয় দৃশ্যের নাট্যাখ্যানের রয়েছে বিপুল সাদৃশ্য। সুলতানের সন্দর্শন শেষে আনন্দিত কবি সংবর্ধিত হয়ে গৃহে ফিরে তাঁর কাতিব আবু দায়লামকে দেশে প্রত্যাবর্তনের পরিকল্পনার কথা বলেন। উৎফুল্ল কবি হাম্মাম খানায় প্রবেশের পরপরই প্ররোচিত সুলতানের পক্ষ থেকে কুচক্রী আয়াজ, *শাহনামা* কাব্যরচনার পাওনা হিসেবে, সুলতান নির্ধারিত পরিবর্তিত পারিতোষিক নিয়ে আসে। বাহকদের বখশিস দিতে গিয়ে নিশ্চিন্ত কবি ঘটনাচক্রে আবিষ্কার করেন, প্রতিশ্রুতি-ভঙ্গ করে ষাট সহস্র সোনার দিনার-এর পরিবর্তে তাঁকে দেওয়া হয়েছে ষাট সহস্র রূপার দিরহাম। আহত ও হতভম্ভ ফেরদৌসী আয়াজের কাছে জানতে পারলেন *শাহনামার* দীর্ঘায়তনের কারণে ও সমস্ত বয়েত সমান ভাল হয়নি বিধায় সুলতান তার পূর্বের মত বদলেছেন; উপরন্তু, কবি রচিত বয়েতের সমালোচনার ভিত্তিতে সুলতান তাঁকে মোতাজেলাপন্থি হিসেবেও সন্দেহ করেছেন। আকস্মিক আঘাতে বিমূঢ় ফেরদৌসী প্রথমে স্তব্ধ ও বিপর্যস্ত হয়ে গেলেও দ্রুত আত্মসংবরণ করে আয়াজকে টাকা বুঝে নেবার রসিদ দস্তখত করে বিদায় করলেন। আমরা দেখতে পাই, আয়াজকে বিদায় করবার পরমুহূর্তে ফেরদৌসী প্রবল কষ্টে ভেঙে পড়েন এবং আবদুল হক অত্যন্ত সফলভাবে ওই মুহূর্তে ভগ্নহৃদয় ফেরদৌসীর অন্তর্গত বেদনা ও ক্ষোভকে সংলাপে সংহত করেন:

> ফেরদৌসী। শাহনামা, শাহনামা... আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ সাধনা, আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ ফসল ...! সেই শাহনামার এই পুরস্কার! ... শাহনামার মূল্য তুমি বুঝলে না মাহমুদ, আমার মূল্য বুঝলে না। ইরানের হারানো ইতিহাসকে আমি বিস্মৃতির অতল গর্ভ থেকে উদ্ধার করেছি, ইরানের অসংখ্য মৃত বীরকে আমি সঞ্জীবিত করেছি, তারা আমার শাহনামার পৃষ্ঠায় অনন্ত কালের জন্যে বেঁচে উঠল। এই শাহনামার মূল্য তুমি বুঝলে না। (আবদুল, ১৯৭৫ : ২১)

শুধু ফরমায়েশের তাবেদার সভাকবি ছিলেন না মহাকবি ফেরদৌসী বরং পারস্যেও এই শ্রেষ্ঠ কাব্যপ্রতিভা মূলত জাতির মর্যাদাপূর্ণ ইতিহাসকে ধরে রাখার দায়েই নিযুক্ত হন দীর্ঘ সন্ধানী ইতিহাসমগ্ন এই মহৎ সাহিত্য রচনায়। পঁয়ত্রিশ বছরের সাধনার ফল *শাহনামার* অবমূল্যায়ন সহ্য করতে না পেরে বেদনাদীর্ণ কবির ক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠার বিশ্বাসযোগ্য যে চিত্র এঁকেছেন আবদুল হক, তা ফেরদৌসীর সংবেদী চরিত্রকে মানবিক উচ্চতায় উপস্থাপন করে। আত্মসম্মানের তাগিদে, তীব্র প্রতিক্রিয়ায় কবি যে তাৎক্ষণিক ভাবেই সুলতান মাহমুদ প্রদত্ত সমুদয় অর্থ দরিদ্র কর্মচারীদের ডেকে দান খয়রাত করে দেন তা ইতিহাস সমর্থিত (ব্রাউন, ১৯০৬ : ১৩৫)। কবির কাতিব বা লেখক দায়লাম যখন তাঁকে প্রশ্ন করেন: "আপনি কি পাগল হয়ে গেলেন?" (আবদুল, ১৯৭৫ : ২২)। তার প্রত্যুত্তরে সুলতানের অগ্রহণযোগ্য অনুগ্রহকে প্রত্যাখ্যানের ভাষায় কবির আত্মসম্মানবোধের সর্বোচ্চ পরিচয় পাওয়া যায় :

> না পাগল হইনি। যা করছি সুস্থ বুদ্ধিতেই করছি। মাহমুদ যা আমাকে দিয়েছে তা আমায় সম্মান করে দেয়নি, অনুগ্রহ করে দান করেছে। আমি তার অনুগ্রহের দান নেব না, নেব না। আমি অনেক মৃত বাদশাকে আমার শাহনামার পৃষ্ঠায় জীবনদান করেছি, একজন সামান্য বাদশার অনুগ্রহের দান আমি নেব না। (আবদুল, ১৯৭৫ : ২৩)

আবদুল হক এর পরপরই ফেরদৌসী চরিত্রে অন্যায় অসম্মানের বিরুদ্ধে এক বিদ্রোহীকে ফুটিয়ে তোলেন, যে রাজ-খড়গকে অগ্রাহ্য করে, কলম দিয়েই অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে ওঠে। ক্রমেই তিনি প্রবল পরাক্রম সুলতানের বিরুদ্ধে আত্মপ্রত্যয়ী হয়ে ওঠেন : "মাহমুদ, আমার লেখনীর শক্তি তোমার সেনাবাহিনীর চেয়ে অনেক বেশী। তুমি যত রাজ্যই জয় কর, তোমার সব যশ আমি ছিনিয়ে নেব।" (আবদুল, ১৯৭৫ : ২৫)

নাটকের ঘটনাক্রমে অত্যন্ত গুরুত্ব পেয়েছে সুলতানের আপাত অবিচার ও প্রবঞ্চনার প্রত্যুত্তরে ফেরদৌসীর সম্মানী প্রত্যাখ্যান ও ব্যঙ্গাত্মক কাব্য লিখে সুলতানের অন্যায়ের বিরুদ্ধাচার। দ্রোহের এই ভিন্নমাত্রিক চরিত্র প্রকাশ করবার জন্য আবদুল হক কবির কার্যকলাপের মধ্য দিয়ে ধাপে ধাপে প্রতিবাদের বিভিন্ন মাত্রাকে যুক্ত করেছেন, যা বয়োবৃদ্ধ চরিত্রটির উপযোগী হয়েছে। এই দৃশ্যের শেষ পর্যায়ে নাট্যকার সুলতানকে ব্যঙ্গ করে রচিত বহুশ্রুত ঐতিহাসিক প্রতিবাদী কবিতাটিকে উপস্থাপন করেন যা ইতিহাসের মানচিত্রকে অতিক্রম করে আজও অস্তিত্বময় :

কবিতা আমার, লালিত্য আর নয়,
রুদ্র-ভীষণ হও তুমি এইবার,
বে ইনসাফীর দানবের পথ রোখো,
জুলফিকারের মতো হও খরধার।
…   …   …

> পানির উপরে লিখিনি আমার নাম,
> কখনো মিশে তা যাবে না বিস্মরণে,
> কালের নিকটে পাব আমি যে ইনাম
> ছিনিয়ে নেবে তা কোন্ দাস-নন্দনে? (আবদুল, ১৯৭৫ : ২৫-২৬)

কবির কৃতজ্ঞতার নজরানা যেমন 'কাব্য', তেমনি অপমানের বিরুদ্ধে তাঁর প্রতিবাদের ভাষাও হয়ে ওঠে 'কাব্য'। ফলে ব্যঙ্গাত্মক কাব্য রচনা করেই ফেরদৌসী তাঁর প্রতি সুলতানের প্রবল অন্যায়ের প্রত্যাঘাত করেছেন এবং সেই বিপন্ন-মুহূর্তেও নিশ্চিন্ত অবসর ও আধ্যাত্মিক জীবনের পরিকল্পনাকে এক লহমায় প্রত্যাহার করে, মৃত্যুর পরোয়ানা মাথায় নিয়ে বেছে নিয়েছেন দীর্ঘ ও অনিশ্চিত জীবনকে। শুভানুধ্যায়ীরা তাঁকে নানাভাবে নিরস্ত করতে চাইলেও আপসকামী মনোভাবকে তিনি ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেন। শেষ অবধি এই ব্যঙ্গ-কবিতা রূপ অস্ত্রটি তাঁর রচিত *শাহনামা*র প্রতিটি নকলের সাথে জুড়ে দিয়ে বিদ্রোহী ফেরদৌসী সুলতানকে অভিসম্পাত দিয়ে ফেরারি হন। প্রাগুক্ত সবকটি ঘটনাই লিপিবদ্ধ ইতিহাস ও প্রচলিত লোকশ্রুতির অংশ। ফেরদৌসী চরিত্রভিত্তিক ঐতিহাসিক নাটক, ফলে কেন্দ্রীয় চরিত্র মহাকবি ফেরদৌসীর আত্মাভিমানী সংবেদনশীল ব্যক্তিত্বের দৃঢ়তা ও অমিত তেজকে উন্মোচনের জন্য দ্বিতীয় দৃশ্যে নাট্যকার এসব ইতিহাসসিদ্ধ কাহিনির নাটকীয় উপস্থাপনে অত্যন্ত কুশলতা ও সংযমের পরিচয় দিয়েছেন।

তৃতীয় দৃশ্যে উজির মায়মন্দী কবি মনুচেহরীর (১০০০-১০৪০ খ্রি.) বরাত দিয়ে সুলতান মাহমুদকে ফেরদৌসীর বিদ্রোহের সংবাদ দেন। সুলতান তাঁর *শাহনামা* গ্রন্থের শেষে এই ব্যঙ্গাত্মক কবিতাটি আবিষ্কার করেন এবং ক্রোধে উন্মাদ হয়ে ওঠেন। ক্ষিপ্ত সুলতান ফেরদৌসীকে অবিলম্বে গ্রেফতার ও লোকসমক্ষে নির্মমভাবে হত্যা করবার নির্দেশ দেন, যাতে এই দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রত্যেক ব্যঙ্গ-কবিকে চিরদিন সতর্ক রাখে।

"কবির কলম" বনাম "রাজদণ্ডের" যে প্রবল বিরোধ, তা আরও ঘনীভূত হয় যখন সুলতান মাহমুদ ফেরদৌসী-রচিত ব্যঙ্গ কবিতার সকল নকলকে বাজেয়াপ্ত করার এবং ফেরদৌসীকে ধরিয়ে দেবার জন্য পাঁচ হাজার দিরহাম পুরস্কার ঘোষণা করেন। এমনকি এই কবিতার পাঠকদেরও কয়েদখানায় বন্দি করা ও দরকার হলে কতল করবার নির্দেশ দেন তিনি। এই নাট্যাংশের শেষে আবদুল হক সংলাপের মধ্যে পূর্বের সাংস্কৃতিক পৃষ্ঠপোষক সুলতান মাহমুদের বিপরীতে দ্রোহ-দমনকারী কঠোর-শাসক সুলতানকে তুলে ধরেন এবং এর মাধ্যমে ফেরদৌসীর প্রতি সুলতানের মানসিকতার ক্রমপরিবর্তন বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠে: "অদৃষ্টের কি পরিহাস, উজির!... ইরানের মৃত অতীত একখানি মহাকাব্যের মধ্য দিয়ে জীবন্ত হয়ে উঠুক আর সে মহাকাব্য আমার দরবারে রচিত হোক এই আমি চেয়েছিলাম, অথচ সেই মহাকাব্যের রচয়িতাকেই আমি আজ প্রাণদণ্ড দিতে চলেছি!" (আবদুল, ১৯৭৫ :৩২)

সুলতান মাহমুদ আরও বলেন, "ফেরদৌসীকে প্রাণদণ্ডই দিতে হবে। কোনো দুর্বলতা নয়, কোনো করুণা নয়, তাকে প্রাণদণ্ডই নিতে হবে। ... তার ব্যঙ্গকবিতা ধ্বংস করে দাও; শাস্তি তাকে পেতেই হবে। ... দুনিয়ার বুক থেকে মুছে ফেল এই কবিতা, আর মুছে ফেল ফেরদৌসীকে।" (আবদুল, ১৯৭৫ : ৩২) এই দৃশ্যে ইতিহাসের মূল ঘটনা প্রবাহকে অক্ষুণ্ন রেখেই নাট্যকার পরবর্তী কাহিনির বিস্তার ঘটিয়েছেন।

চতুর্থ দৃশ্যে কবি সুলতানের রাজরোষ থেকে রক্ষা পেতে গজনী ত্যাগ করেন এবং পালিয়ে মুসাফির সেজে হেরাত শহরে চলে আসেন। এই পর্বে ঘটনাক্রমে ইতিহাস সমর্থিত কাহিনিসূত্র থাকলেও নাট্যাখ্যানে আবদুল হকের সৃজনশীল শক্তিমান সংযোজন রয়েছে। এই দৃশ্যে নাট্যকার ফেরদৌসীর ফেরারি জীবনকে সামনে নিয়ে আসেন এবং ঘটনাচক্রে কবি তাঁর বাল্যবন্ধু কুতুবখানার মালিক অকৃতদার আবুল মা'আলীর আশ্রয় লাভ করেন। হেরাত শহরেও সুলতানের বাহিনী ফেরদৌসীর সন্ধানে ব্যতিব্যস্ত জেনেও মা'আলী চরিত্রটিকে নাট্যকার সাহসী ব্যক্তিত্ব হিসেবে নির্মাণ করেন। তাই মা'আলীর প্রতি ফেরদৌসী 'আমি মৃত্যুর দূতকে সঙ্গে নিয়ে এসেছি!' (আবদুল, ১৯৭৫ : ৪০)। এই সতর্ক বাণী উচ্চারণ করা সত্ত্বেও কতল হবার ভয়কে অগ্রাহ্য করে মা'আলী ঝুঁকি নিয়ে ফেরদৌসীকে রক্ষায় নিযুক্ত হন এবং বলেন — "আমার প্রাণ নেবে? কাসেম, কারো জন্যে প্রাণ দিতে আমি আজ পর্যন্ত পারিনি। প্রাণের বড়ো মায়া। তবু দেখি এবার, এই বৃদ্ধ বয়সে পারি কিনা" (আবদুল, ১৯৭৫ : ৪০)। এখানে উল্লেখ্য, ফেরদৌসীর হেরাতে এসে গ্রন্থ ব্যবসায়ীর আশ্রয়ে আত্মগোপনের বিষয়টি ইতিহাসসিদ্ধ। আবুল মা'আলী চরিত্রটি কবি আযাকির পিতা গ্রন্থ-বিক্রেতা ইসমাইল, মতান্তরে আবুল মা'আলী অনুসরণে পরিকল্পিত। (ব্রাউন, ১৯০৬ : ১৪০)

এই দৃশ্যে আরো একটি উজ্জ্বল অনৈতিহাসিক চরিত্র নির্মাণ করেন আবদুল হক : তিনি হেরাতের পুঁথি বিক্রেতা আবুল মা'আলীর বন্ধু আলী জামশেদ। এই চরিত্রটির মধ্য দিয়ে আবদুল হক মহাকবি ফেরদৌসীর অমর সাহিত্যকর্মের একজন প্রকৃত অনুরাগীকে উপস্থাপন করেছেন। আলী জামশেদ সুলতানের অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রবীণ কবি ফেরদৌসীর প্রতিবাদের দুঃসাহসিকতাকে সম্মান করেন এবং কবির *শাহনামা* ও সুলতানের উদ্দেশ্যে রচিত ব্যঙ্গাত্মক কবিতাটিরও আগ্রহী পাঠক তিনি। ব্যক্তিজীবনে নিবিড় পাঠানুরাগী আবদুল হক চরিত্রদ্বয়ের সংলাপের মধ্য দিয়ে প্রকৃত সাহিত্যপ্রেমীদের জগতের একটি ছবি তুলে ধরেন :

> জামশেদ। শাহনামার শেষ কিস্তিটা কয়েক দিনের জন্যে পড়তে দেবেন নাকি?
> মা'আলী। দুনিয়ার সব পড়ুয়াই যদি আপনার মতো হতো অর্থাৎ কেবল ধার করে পড়তো তাহলে আমার মতো পুঁথি ব্যবসায়ীদের রুটি জুটত না।
> জামশেদ। আমরা ধার করে পুঁথি পড়ি আর লোকের কাছে সেই পুঁথির গল্প করি, তাই হয়তো অনেকের পুঁথি কেনার ইচ্ছাটা ধারালো ওঠে। (আবদুল, ১৯৭৫ : ৩৭)

এই দৃশ্যে আবদুল হক ঐতিহাসিক-অনৈতিহাসিক চরিত্রের সমন্বয়ে নাট্যাখ্যানের সম্পূরক সূত্রগুলোকে যৌক্তিকভাবে সংযুক্ত করবার ক্ষেত্র নির্মাণ করেন। একই সঙ্গে নাট্যকার নিবিড় মনোযোগে তদানীন্তন সাহিত্য-চর্চা ও গ্রন্থ সংস্কৃতির একটি নিপুণ চিত্র অঙ্কন করেন, যার মাধ্যমে এই নাটকের ইতিহাসভিত্তিক যুগাবহকে অনুপুঙ্খভাবে তুলে ধরেন।

পঞ্চম দৃশ্যের ঘটনাস্থলও মা'আলীর কুতুবখানা। এই দৃশ্যে নাট্যকার অত্যন্ত সুকৌশলে দুটি কাজ সম্পন্ন করেন : ক. ফেরদৌসীর কবিসত্তা ও পিতৃসত্তার অন্দর-মহলকে অংশত দর্শকের সামনে উন্মোচিত করা; খ. ফেরদৌসীকে বন্দি করতে আসা সুলতান প্রেরিত কোতোয়ালকে কেন্দ্র করে নাট্যোৎকণ্ঠাকে তীব্র করে তোলা।

গভীর রাতে কথোপকথনের এক পর্যায়ে নির্ঘুম ফেরদৌসী মা'আলীর কাছে তাঁর সাহিত্য-সৃষ্টির অনিবার্য তাড়না প্রসঙ্গে মুখ খোলেন, যার ভেতর দিয়ে বর্ষীয়ান মহাকবি ফেরদৌসীর দীর্ঘ কাব্যসাধনার নেপথ্যের প্রধান প্রেরণাকে সামনে আনেন নাট্যকার: "...মানে, আমি যাদের কাহিনী লিখছি তাদের কান্নার আওয়াজ। তারা আমার মনের দিগন্তে-দিগন্তে শুধু কেঁদে ফেরে আর ফরিয়াদ জানায়, আমাদের কথা তুমি লেখো, আমাদের কথা তুমি তোমার কাব্যে বাঁচিয়ে তোলো, আমাদের প্রাণ দাও ... (আবদুল, ১৯৭৫ : ৪২-৪৩)

এরই সমান্তরালে কন্যার জন্যে উদ্বিগ্ন পিতৃহৃদয়ের পরিচয় মেলে, যে পিতা তাঁর কন্যার সংবাদ-প্রাপ্তির আশায় অধীর। সুদূর তুস নগরীতে ফেলে আসা মা-হারা বিবাহযোগ্যা কন্যা রুদাবা আর বোন ফাতেমার কল্যাণ-ভাবনায় উৎকণ্ঠিত কবির সংলাপে পিতৃসত্তার দায়বোধ ফুটে ওঠে : "বড় চিন্তায় আছি ওদের জন্যে। বাড়িতে পুরুষ মানুষ নেই, রুদাবা লায়েক হয়ে এলো, ... কোনো রকমে ওর বিয়েটা দিতে পারলে আমি অনেকটা নিশ্চিন্ত হতাম।" (আবদুল, ১৯৭৫ : ৪৩-৪৪)

যদিও সুলতানের অসম্মানের প্রতিবাদে শেষ উপার্জন ষাট হাজার দিরহাম বিলিয়ে দিয়েছেন আত্মাভিমানী কবি, কিন্তু মানুষ ও পিতা হিসেবে পরিবারের প্রতি, দায়ভারকে তিনি এড়িয়ে যাননি। এ প্রসঙ্গে মা'আলী একাধিকবার ফেরদৌসীকে 'একগুঁয়ে মানুষ' হিসেবে অভিহিত করেছেন। এর মাধ্যমে নাট্যকার কবি-চরিত্রের অন্যতম লক্ষণ আত্মাভিমানকে চিহ্নিত করলেও, একইসাথে প্রতিকূল পরিস্থিতিতে তার প্রখর আত্মসম্মাানের প্রকাশ ঘটিয়ে তাঁকে মানবিক অথচ ব্যক্তিত্ববান করে তুলে ধরেছেন —

> মা'আলী। এতটা যে ঘটবে তা কি তুমি ভেবে দেখেছিলে ষাট হাজার দিরহাম বিলিয়ে দেওয়ার সময়, আর সেই ব্যঙ্গ কবিতা লেখার সময়? (আবদুল, ১৯৭৫ : ৪৪)
> ফেরদৌসী। না, ভাবিনি, তা বলে এমন একটা বেইনসাফীর প্রতিবাদ করতে হবে না, একথাও আমি ভাবতে পারি না।... এত বড় বেইনসাফীর পরেও যে মাথা ঠাণ্ডা রাখতে পারে সে কাপুরুষ, আর কাপুরুষের উপযুক্ত শাস্তি হচ্ছে বেইনসাফী। (আবদুল, ১৯৭৫ : ৪৪)

পুরো নাটক জুড়েই নাট্যকার ফেরদৌসীকে আদ্যোপান্ত অকুতোভয় একজন মানুষ হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। সেই দিক থেকে এই দৃশ্যটি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। কেননা, এই দৃশ্যেই গভীর রাতে জামশেদের কাছ থেকে জানা যায় যে, গজনী থেকে সুলতানের কোতোয়াল কবিকে ধরতে হেরাতে পৌঁছে গেছে, এবং আজ রাতেই তাঁকে গ্রেফতার করা হবে। খবরটি জানামাত্র, ফেরদৌসী আশ্রয় ত্যাগ করতে প্রস্তুত হন, যাতে কোনোভাবেই তাঁর কারণে কেউ বিপদগ্রস্ত না হয়। বহু চেষ্টায় অরক্ষিত কবির একলা বেরিয়ে যাওয়া ঠেকানো সম্ভব হলেও, ফেরদৌসীকে অন্য জায়গায় সরিয়ে নেবার আগেই, কোতোয়াল মা'আলীর বাড়িতে এসে উপস্থিত হয়। নিঃসন্দেহে পুরো নাটকে এই দৃশ্যটিতে নাট্যোৎকণ্ঠা চরম পর্যায়ে পৌঁছে যায়, যখন মা'আলী ও জামশেদ কবিকে অবধারিত বন্দিত্ব ও মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করবার জন্য কৌশল খাটিয়ে শেষ চেষ্টা চালায়। উভয় চরিত্রই হঠাৎ বচসার মাধ্যমে কোতোয়ালকে বিভ্রান্ত করতে সক্ষম হয়, যে তারা দুজনই পৃথকভাবে ফেরদৌসীকে ধরিয়ে দিয়ে পারিশ্রমিক পেতে উদগ্রীব। কোতোয়ালের জেরার মুখে যে প্রত্যুত্তর সেটিও এ নাটকের উজ্জ্বল একটি অংশ। এই পর্বে নাট্যপরিস্থিতিকে অত্যন্ত সুচারুভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হন আবদুল হক এবং তা অর্জনে তিনি পরিমিত হাস্যরসের প্রয়োগ ঘটান :

> মা'আলী। ... আমি তাকে ধরিয়ে দিতে পারি হুজুর, তাকে ধরা খুবই সোজা হুজুর, কিন্তু হুজুর, (সানুনয়ে) সে যদি ফেরদৌসী হয় তাহলে বখশিশ চাই। (আবদুল, ১৯৭৫ : ৪৯)
> জামশেদঃ (মা'আলীকে) বখশীশ একা আপনার কেমন করে হয় সাহেব? লোকটাকে আমিই না প্রথমে আবিষ্কার করে আপনার কাছে এনেছিলাম? এখন আপনি একাই বখশিশ চান? আপনি তো ভারী লোভী? (আবদুল, ১৯৭৫ : ৪৯)
>
> ... ...
>
> মা'আলী। সে কি আপনার কেনা গোলাম? পেটের দায়ে যে পাঁচ দুয়ারে ঘুরে বেড়ান, এখানেও সে আসতই। এটাও যে না বোঝে সে একটা ছাগল।
> জামসেদ। আমি যদি ছাগল হই, তবে আপনি উট। (আবদুল, ১৯৭৫ : ৫০)

পাল্টা প্রতিবাদ করে কলহ বাধিয়ে দেয়াতে কোতোয়ালকে পুরোপুরি ধোঁকা দেয়া সম্ভব হয়। এই পর্যায়ে জামশেদ কোতোয়ালের বাহিনীকে নিয়ে বিভিন্ন মসজিদে ফেরদৌসীর খোঁজে চলে যায় আর মা'আলী কোতোয়ালকে মদ্যপানের আমন্ত্রণে প্রলুব্ধ করে ব্যস্ত রাখে। পরিণামে ফেরদৌসীর জীবন রক্ষা হয়। রসনিষ্পত্তিগত দিক থেকে ঐতিহাসিক আখ্যানের সম্পূরক মৌলিক দৃশ্য পরিকল্পনার প্রকৃষ্ট নিদর্শন হিসেবে পঞ্চম দৃশ্যটি নিঃসন্দেহে বিশেষভাবে উজ্জ্বল। এখানে লক্ষণীয়, নাটকটি কবি ফেরদৌসীর সাহসিকতার ঐতিহাসিক আখ্যান হলেও এ নাটকের ঐতিহাসিক-অনৈতিহাসিক অপ্রধান চরিত্রগুলির সাহসিকতাকেও আবদুল হক শিল্পিতভাবেই প্রাধান্য দিয়েছেন।

সাত বছর পরের দৃশ্যপটে কবি বনাম সুলতানের কেন্দ্রীয় দ্বন্দ্ব ষষ্ঠ দৃশ্যে নিষ্পত্তি অভিমুখী হয়। প্রসিদ্ধ কাব্যানুরাগী ও পরে অমাত্যদের মিথ্যাচারে প্রভাবিত হয়ে কবিকে হত্যার নির্দেশ প্রদানকারী প্রতিহিংসাপরায়ণ যে সুলতানকে পূর্বে নাট্যকার উপস্থাপন

করেন, সময়ের স্রোতে তাঁরই ক্রমরূপান্তরকে তুলে ধরা হয় এই দৃশ্যে। এক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন কৌশলী উজির মায়মন্দী, বিশেষত সুলতানের ক্ষোভ প্রশমন ও আত্মবোধনে তার ভূমিকা ইতিহাসসিদ্ধ প্রভাবকের (ব্রাউন, ১৯০৬ : ১৩৭)। স্মর্তব্য, পরিণাম-নিকটবর্তী দৃশ্যে নাট্যকার সচেতনভাবেই ইতিহাসের মূলসূত্রের অনুসরণ করেছেন। বিশেষত চাহারে মাকালে'তে নিযামী আরুযী বর্ণিত সুলতান ও মন্ত্রী মায়মন্দীর আলাপনের লোকশ্রুত আখ্যানের অনুরূপেই নির্মিত হয়েছে এ দৃশ্যের ঘটনাক্রম। ভারত-সীমান্তে কোনো এক পরিস্থিতিতে উজির মায়মন্দী হঠাৎ *শাহনামা*র বয়েত থেকে আবৃত্তি করে ফেললে দীর্ঘ সময়ের পর উত্থাপিত হয় 'নাম উচ্চারণ নিষিদ্ধ' (আবদুল, ১৯৭৫ : ৫৮) কবি ফেরদৌসীর প্রসঙ্গ। একদিকে কবির নাম শোনার সাথে সাথে ব্যঙ্গ-কবিতার বিষময় স্মৃতি মনে পড়ে যায় সুলতানের, অন্যদিকে তাঁর দরবারের সাংস্কৃতিক গরিমার স্মৃতি তাকে তাড়িত করে :

> মাহমুদ। এই হচ্ছে একটা প্রমাণ যে ফেরদৌসীকে লোকে এখনো ভোলেনি। আর...আর ভোলেনি সেই ব্যঙ্গ কবিতা। (আবদুল, ১৯৭৫ : ৫৮)
> মাহমুদ। আমি জীবনে দু'টি জিনিস চেয়েছিলাম মায়মন্দী।... আমার সাম্রাজ্য হবে অতুলনীয়। আর চেয়েছিলাম, কবি আর মনীষীদের সমাবেশে আমার দরবার হবে সারা জাহানে মশহুর।... আমি জানি ... দুনিয়ার বিস্তর মানুষ মনে করে আমি ফেরদৌসীর উপর অবিচার করেছি, আমি গুণীদের সমাদর করতে জানি না।... (আবদুল, ১৯৭৫ : ৫৮)

লক্ষণীয়, পারস্যের জাতীয় গাথা *শাহনামাকে* নিয়ে যাঁর বিপুল গর্ব ছিল, সেই সুলতানের জন্যই শেষ জীবনে এই অমর কাব্যের স্রষ্টার মাথায় ছিল মৃত্যুর পরোয়ানা। *শাহনামা*র কালজয়ী শক্তিকে সুলতান অনুধাবন করেছিলেন বলেই, এই দৃশ্যে শুধু রোষ নয় বরং তাঁর উচ্চকিত ক্ষোভের উৎসার থেকে বোধগম্য হয়, এই বিষময় বিরোধ তাঁকেও পীড়িত করে চলেছে নিরন্তর। আলাপের এক পর্যায়ে মায়মন্দী একদিকে ব্যঙ্গ-কবিতাটির দীর্ঘ অনুপস্থিতি ও অন্য দিকে সাত বছরের নির্বাসিত-জীবনে আত্মাভিমানী স্বীকৃতিহীন বৃদ্ধ-কবির সম্ভাব্য অনুতাপের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন যা ক্রমেই সুলতানের ক্রোধকে প্রশমিত করে ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থানে নিয়ে আসে। এ সময় মায়মন্দী সুলতানকে দয়া ও উদারতা দিয়ে জন-বিশ্বাসের ভ্রান্ত ধারণাকে মোকাবেলা করার পরামর্শ দেন। এছাড়াও মায়মন্দী বলেন : "*শাহনামা* আমরা ধ্বংস করিনি, করতেও চাইনি, লাখো লাখো লোক এই মহাকাব্য পড়ছে আর শুনছে। এর লেখক যদি নির্বাসিত অবস্থায় মারা যান তবে লোকে কি মনে করবে।" (আবদুল, ১৯৭৫ : ৫৯)

বস্তুত মায়মন্দীর কথাতেই ক্রমশ সুলতানের দৃষ্টিভঙ্গির রূপান্তর ঘটে এবং বিদ্বেষের বিষচক্র থেকে বেরিয়ে এসে ফেরদৌসীকে তিনি শেষ পর্যন্ত ক্ষমা ঘোষণা করেন ও প্রাপ্য পারিতোষিক মিটিয়ে দেবার সিদ্ধান্ত নেন। কাহিনির এই বিকাশ ও পরিণাম সম্পূর্ণত ইতিহাস অনুসারী। লক্ষণীয়, নাটকের একাধিক স্থানেই নাট্যকার, সব বিরোধ ও প্রত্যাঘাতের ঊর্ধ্বে ক্ষমার পথে সমাধানকে সন্ধানের বিশেষ দর্শনটিকে উত্থাপন করেছেন কৌশলে। তবে ষষ্ঠ দৃশ্যে ফেরদৌসীকে ক্ষমা করার মুহূর্তেও সুলতান স্মরণ করিয়ে দেন যে আগেও কবিকে বঞ্চিত করবার কোনো অভিপ্রায় তার ছিল না। তার এই বক্তব্য ও ফেরদৌসীকে শেষ পর্যন্ত "বিষধর সাপ" (আবদুল, ১৯৭৫ : ৫৯) হিসেবে অভিহিত করা থেকে অনুমিত হয় যে নেপথ্যের ষড়যন্ত্র তাঁর কাছে শেষপর্যন্ত অজ্ঞাতই থেকে যায়। এখানেই নাট্য-দ্বন্দ্বকে জীইয়ে রাখতে নাট্যকারের ইতিহাসের অতিরেক মৌলিক কল্পনা সফল।

*ফেরদৌসী*তে নাট্যকার কোনো চরিত্রকেই একরৈখিকভাবে দাঁড় করাননি, বরং ইতি ও নেতির সমন্বয়ে মানবিক দোষ-গুণ সম্পন্ন পরিবর্তমান জটিল ব্যক্তিসত্তার দ্বান্দ্বিক রূপায়ণ হয়ে উঠেছে আবদুল হকের চরিত্রায়ণের মূল কৌশল। ফলে ষষ্ঠ দৃশ্যে নাট্যকারের ধারাবাহিক নির্মাণ ও ইতিহাসের সত্যানুগত্যে নিঃসন্দেহে এই সুলতান প্রথম দৃশ্যের চেয়ে অপেক্ষাকৃত সহনশীল ও পরিণত। এছাড়াও নাট্য-গতির বিচারে, ঐতিহাসিক ঘটনাক্রমে প্রয়োজনীয় রদবদল, সংযোজন-বিয়োজন, উভয়বিধ কৌশলে নাট্যকার আবদুল হক, কবি ফেরদৌসী বনাম সুলতান মাহমুদ এর বহুশ্রুত বিরোধের পরিণাম ও ইতিহাস-ভিত্তিক নিষ্পত্তির ইঙ্গিত দেন এ দৃশ্যে।

সপ্তম দৃশ্যটির প্রেক্ষাপট তুস নগর। এই দৃশ্যটি ব্যবহৃত হয়েছে ফেরদৌসীর জীবনের অন্তিম অধ্যায় পূর্ব সংযোগ দৃশ্য হিসেবে, যাতে স্থান ও কালের ঐতিহাসিকতা রক্ষিত হয়েছে। এছাড়াও কবির একমাত্র পারিবারিক পিছুটান ইতিহাসে কথিত ফেরদৌসী–কন্যার প্রসঙ্গটিও এই দৃশ্যে বাস্তব-রূপ পেয়েছে, কবির অবর্তমানে কন্যা রুদাবা ও বোন ফাতিমার অর্থকষ্টে ক্লিষ্ট জীবন-যাপনের দক্ষ রূপায়ণে। নাট্যকার আবদুল হকের কৃতিত্ব এখানেই যে তিনি ফেরদৌসীর চরিত-নাটক নির্মাণ করতে গিয়ে মূল ঐতিহাসিক ঘটনা ও প্রসঙ্গগুলিকে নাটকের অন্যান্য শাখা-কাহিনির সাথে বিশ্বাসযোগ্যভাবে যুক্ত করতে সক্ষম হয়েছেন, তাঁর সমাজ-বাস্তবতাবোধ, সৃজনশীল কল্পনাশক্তি ও ইতিহাস-নিষ্ঠার যথাযথ সমন্বয়ে। যেমন এই দৃশ্যেই তদানীন্তন সমাজব্যবস্থায় অভিভাবকের অনুপস্থিতিতে বয়স্থা বিবাহযোগ্যা কন্যাকে যে সামাজিক পীড়ন ও বিড়ম্বনাকে সহ্য করতে হয় তা তিনি তুলে ধরেন রুদাবার অতিআগ্রহী পাণিপ্রার্থী জায়েদ ও পড়শিনী খায়রুজানের সংলাপের মধ্য দিয়ে :

> জায়েদ। অন্যায়টা কি বলেছি? বিয়ে তো কোথাও তোমার দিতেই হবে, আর এদিকে আমারও সংসার খালি কয়েক মাস থেকে। তোমার ভাবী মারা যাওয়ার পর থেকে, বুঝলে কিনা-সংসার একদম অচল। তাই–আর এদিকে তোমারও তো বয়েস হয়েছে, বিয়ে হলে এতদিন তিন-চারটে ছেলের মা হয়ে যেতে। (আবদুল, ১৯৭৫ : ৬৪)
>
> খায়রুজান। সোমত্ত মেয়ে ঘরে রাখতে নেই ফাতেমা বু', রাখলেই পাঁচ মুখে পাঁচ কথা ওঠে।... শীগ্‌গীর এ জঞ্জাল যেখানে হয় বিদায় করে দাও। (আবদুল, ১৯৭৫ : ৭৫-৭৬)

এরই বিপরীতে ফেরদৌসী-তনয়া রুদাবার সংলাপে তাঁর বাবার স্বভাব অনুসারী চারিত্রিক দৃঢ়তা ও আত্মসম্মানবোধের প্রতিবাদী পরিচয় পাওয়া যায়– "রুদাবা। দেশে কি ইনসাফ নেই? জমি যা আছে বিক্রি করে ওর পাওনাটা শোধ করে দিন,...আর আমাকে তাড়াতাড়ি বিদায় করে দিন রাখাল-টাখাল যার হাতে হোক; তবু ওই শকুনটার হাতে নয়।" (আবদুল, ১৯৭৫ : ৭৪)

পরিকল্পনার দিক থেকে রুদাবা চরিত্রটি আবদুল হকের মৌলিক সৃষ্টি।[11] ফেরদৌসী-কন্যার চরিত্রের যে বলিষ্ঠতার ইঙ্গিত (ব্রাউন, ১৯০৬ : ১৩৮) ইতিহাসে লিপিবদ্ধ আছে তারই অনুপ্রেরণায় আবদুল হক সপ্তম দৃশ্যে রুদাবা চরিত্রটিকে পিতার দাঢ্য ও দ্রোহ সংবলিত করেই নির্মাণ করেছেন, যার প্রমাণ অনিশ্চিত দারিদ্র্যের মধ্যে সামাজিক চাপ থাকা সত্ত্বেও মধ্যবয়স্ক বিপত্নীক ধনী প্রতিবেশী জায়েদের জোরপূর্বক বিয়ের প্রস্তাবকে সে প্রত্যাখ্যান করেছে।

সপ্তম দৃশ্যেই নাট্যকার রুদাবার প্রেমানুরাগী যুবক চরিত্র ফারুককে উপস্থাপন করেন এবং সুকৌশলে রুদাবার প্রতি অনুভূতি প্রকাশের সময়ে *শাহনামার* কাব্যাংশে বিধৃত 'রুদাবার রূপ বর্ণনাকে' (আবদুল, ১৯৭৫ : ৬৮) সংযুক্ত করে দৃশ্যটিকে হৃদয়গ্রাহী করে তোলেন।

এই দৃশ্যে নাট্যকার মূলত কন্যা রুদাবার মাধ্যমে কবি ফেরদৌসীর পারিবারিক জীবনের ছিন্ন সূত্রটিকে যুক্ত করেছেন যা নাট্যকারের ইতিহাস-নিষ্ঠারই পরিচায়ক। স্মর্তব্য যে, প্রথম দৃশ্যে, গজনীতে *শাহনামা* রচনা শেষে, ফেরদৌসী সুলতানের কাছে এই কন্যার বিয়ের দায়িত্বের কথা জানিয়ে তুস-এ ফিরে যাবার জন্য অবসর চেয়ে বিদায় নিয়েছিলেন; পঞ্চম দৃশ্যেও হেরাতে বন্ধু মা'আলীর কাছে ফেরারি কবির কন্যাকে নিয়ে উদ্বিগ্ন পিতৃহৃদয়ের পরিচয় মেলে; এরই ধারাবাহিকতায় ইতিহাস অনুসারী নাট্যকার আবদুল হক সপ্তম দৃশ্যের শেষাংশে বহু প্রতীক্ষার পর, প্রায় এক দশক পরে, ভগ্নদেহ কবির স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন দেখান এবং ক্রমশ এই চরিত-নাট্যাখ্যান ইতিহাস প্রদর্শিত পথেই ফেরদৌসীর জীবনের শেষ অধ্যায়কে নিকটবর্তী করে তোলে।

পারস্যের শ্রেষ্ঠ মহাকবি ফেরদৌসীর চরিতভিত্তিক নাট্যাখ্যানের অষ্টম দৃশ্যটি নাটকের পরিণামী দৃশ্য। কালজয়ী *শাহনামার* রচয়িতা দেশ ও জাতিকে অমৃত উপহার দিলেও বিনিময়ে তাঁর জীবন ছিল বিষময়। তাঁর সংঘাতময় শেষ জীবনের ইতিহাস-নির্দেশিত বিভিন্ন সংকটকে অনুসরণ করে, নাট্যকার কবির জন্মভূমি তুস-এ বিস্তৃত করেছেন এই নাটকের অন্তিম দৃশ্যপট। নগরীর উপকণ্ঠে, কবিগৃহ থেকে একটু দূরে, পড়ন্ত বেলায়, রুদাবার প্রণয়ী তরুণ কাব্যানুরাগী ফারুক ও রোগজীর্ণ আশি বছরের প্রবীণ ফেরদৌসীর *শাহনামা*কে ঘিরে সংগ্রামী স্মৃতির রোমন্থন ও অতীতমুখী আলাপচারিতার পটভূমিতে নির্মিত হয়েছে কবির প্রয়াণপূর্ব মুহূর্ত।

> ফেরদৌসী। শাহনামা লোকে পড়ে, ফারুক?
> ফারুক। পড়ে। খুব পড়ে। কত মোশায়েরায় শাহনামা পড়া হয়।
>
> ... ...
>
> ফারুক। না না, কোনো সুলতানের ক্ষমতা নয় আপনাকে স্তব্ধ করে দেওয়া।...আপনার শাহনামা নিরবধিকাল মানুষকে আনন্দ দেবে। (আবদুল, ১৯৭৫ : ৮১)
>
> ... ...
>
> ফেরদৌসী। সেদিনের কথা আমি কখনো ভুলব না। আমার আজীবন সাধনার স্বীকৃতি যখন এসে পৌঁছলো ষাট হাজার দিনারের রূপে নয়, ষাট হাজার দিরহামের রূপে, তখন তা এলো শিল্পীর প্রতি ক্ষমতাবানদের অবজ্ঞার প্রতীকরূপে। (আবদুল, ১৯৭৫ : ৮৩)
>
> ... ...
>
> ফেরদৌসী। হঠাৎ এক উদার মুহূর্তে মনে হয়েছিল আমিতো ঘৃণার কবি নই, তবে কেন আমি এই হলাহলের পেয়ালা বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছি! সেই সময় কবিতাটা নষ্ট করে ফেলেছিলাম। পরে অনুতাপ করেছি, কারণ ওর কিছু অংশ আমি ভুলে গেছি। (আবদুল, ১৯৭৫ : ৮২)

সৃষ্টির গৌরব ও আত্মসম্মানের ক্ষেত্রে যে কোনো আপস করা যায় না, পারস্যকে পুনরুজ্জীবিত করা অমর কাব্যের স্রষ্টা আত্মাভিমানী ফেরদৌসীর জীবনের শেষপর্বের অনমনীয় সংগ্রাম তারই সাক্ষ্য দেয়। অন্তিম মুহূর্ত পর্যন্ত তাঁকে তাড়িত করেছে সুলতানের সাথে সংঘর্ষের-অপমানের তিক্ত স্মৃতি; আবার এক সময়কার প্রতিবাদের প্রতীক সেই ব্যঙ্গ-কবিতাটিকে নিয়েও শ্রেয়-অশ্রেয়-এর আত্মদ্বন্দ্বে অপরাধবোধে ভুগেছেন কবি, মনে হয়েছে এ ঘৃণাময় 'প্রতিহিংসার ফণা' (আবদুল, ১৯৭৫ : ৮৫); পরবর্তীকালে লেখাটিকে নষ্ট করে ফেলে অনুতপ্তও হয়েছেন তিনি। শেষ অবধি নেপথ্যে ভেসে এসে মিলিয়ে যাওয়া কিশোরকণ্ঠে কবিতাটি শেষবার শুনবার আকুতিও জেগেছে তার মনে, অথচ এরই বিষবাষ্পে কবির জীবন থেকে ঝরে গেছে অমূল্য সময়। মানুষের মনের এই বৈপরীত্যপূর্ণ স্বভাব ও বিচিত্র দোলাচলকে সন্নিবেশিত করে আবদুল হক মহাকবি ফেরদৌসীর ঐতিহাসিক চরিত্রটিকে মানবিক করে তুলেছেন।

আবার চরিত্রায়ণ-কৌশলের বিবেচনায় ইতিহাসের টুকরো তথ্যের যোগসূত্রে মহাকবির দ্রোহীসত্তা ও তার বিপরীতে-স্নেহশীল পিতা — এই দুয়ের সমন্বয়ে ফেরদৌসীর পরিণত অবয়বকে পূর্ণতা দিয়েছেন নাট্যকার — যিনি জীবনের শেষ অধ্যায়ে দাঁড়িয়েও সংসারের মায়ায় সিক্ত; অকাল প্রয়াত পুত্রের মৃত্যুতে চিরশোকার্ত; কন্যাকে সুন্দরভাবে পাত্রস্থ করবার জন্য উদ্বিগ্ন; গৃহ শূন্য হয়ে যাবার চিন্তায় আশঙ্কিত। স্বভাবতই তরুণ ফারুকের মধ্যে কবি খুঁজে ফিরেছেন তাঁর মৃত সন্তানের ছায়া এবং রুদাবার পাণিপ্রার্থীকে। আলাপচারিতার একপর্যায়ে, ফেরদৌসীর জীবনের বিদ্রোহ ও বিপর্যয়ের প্রতীক, দীর্ঘদিন ধরে ভুলতে চাওয়া সুলতান-কবির বিরোধের নেপথ্যের সেই ক্ষুরধার কবিতাকে ঘিরে, কবির বোঝাপড়ার অমীমাংসিত মুহূর্তেই সহসা কবির জীবনের যতিচিহ্ন টানেন নাট্যকার (আবদুল, ১৯৭৫ : ৮৫)। শেষ অবধি নেপথ্যের ষড়যন্ত্র

কবির কাছে সংগোপন থেকে গেলেও শেষ দৃশ্যে অতীতকে ফিরে দেখার অভিঘাতময় প্রক্রিয়ায় নাটকটি ও কবি-চরিত্র ইতিহাসসিদ্ধ পরিণামের দিকে ধাবিত হয়েছে। প্রিয় নগরীতে স্বজন-সন্তানকে পিছে ফেলে মহাকবির এই প্রয়াণ ইতিহাস-সম্মত (আবদুল, ১৯৭৫ : ৮৫)। তবে ইতিহাসের অনুসারী হলেও শেষ দৃশ্যে পাঠক-দর্শকের প্রস্তুতিহীন আকস্মিকতায় নির্মিত এই মৃত্যু-মুহূর্তটি রসনিষ্পত্তিগত দিক থেকে কিছুটা হলেও নাটকের গতিপ্রবাহকে ক্ষুণ্ন করে। সম্ভবত এটিই *ফেরদৌসী* নাটকের লক্ষণীয় সীমাবদ্ধতা। পূর্বে উল্লিখিত বহুশ্রুত কাহিনির অনুসরণে কবির মৃত্যুর অনতিপরেই, সুলতান প্রতিশ্রুত ষাট হাজার স্বর্ণ দিনার সমেত প্রবেশ ঘটে সুলতানের অনুচরদের[১২] (আবদুল, ১৯৭৫ : ৮৯)। এর মাধ্যমেই আবদুল হক তুলে ধরেন কবির কলম বনাম রাজদণ্ডের বিরোধের ঐতিহাসিক নিষ্পত্তির করুণ শ্লেষাত্মক পরিণতিকে।

ইতিহাসের সূত্র মেনেই কবির জানাজা পড়াতে অস্বীকৃতি জানান এক মোল্লা[১৩] (ব্রাউন, ১৯০৬ : ১৩৮)। তার অভিযোগে প্রতিধ্বনিত হয় অতীতের শত্রুদের কণ্ঠস্বর : "মোল্লা। ফেরদৌসী খাঁটি মুসলমান ছিলেন না। ...যাদের কথা নিয়ে *শাহনামা* লিখলেন, তাদের প্রায় সবাই তো কাফের।" (আবদুল, ১৯৭৫ : ৯০)

শেষ দৃশ্যের শোকঘন মুহূর্ত আরো একবার ইতিহাসের সত্যে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, জীবদ্দশায় স্বীকৃতি-বঞ্চিত মহাকবি পিতার অপচিত জীবনের জন্য কবি কন্যা রুদাবার করুণ হাহাকার ও সুলতান প্রেরিত ইনামের তীব্র প্রত্যাখ্যানে :

> রুদাবা । যে সময় তাঁর বুক ফুলের মালায় ভারী হয়ে আসার কথা, সেই সময়ে তাঁর বুড়ো বুকের উপর বাজ পড়লো।...যে টাকার জন্যে এতো অপমান এতো জুলুম আব্বাকে সইতে হল, সে টাকা নেবো আমরা?...ফিরিয়ে দিন এ টাকা যেখান থেকে এসেছে।... যিনিই পাঠিয়ে থাকুন, এই অভিশপ্ত টাকা আমার বাড়িতে উঠবেনা।... উঠতে আমি দেবোনা। (আবদুল, ১৯৭৫ : ৯২-৯৩)

লক্ষণীয়, নাট্যকার ঐতিহাসিক পটভূমির বিভিন্ন প্রান্তকে সমন্বিত করতে পেরেছেন এই দৃশ্যে। আবার কেন্দ্রীয় প্রধান চরিত্র ফেরদৌসীর অন্তর্দ্বন্দ্ব ও পরিণামের সঙ্গে প্রাসঙ্গিকভাবে যুক্ত রাখতে পেরেছেন মূল ঐতিহাসিক আখ্যানটিকে, যা চরিত-নাটকের শিল্পসিদ্ধির অন্যতম শর্ত। কন্যা রুদাবাসহ, প্রতিবাদকারী মোল্লা, সুলতানের লোক–প্রতিটি ঐতিহাসিক চরিত্রের ভূমিকা প্রচলিত ইতিহাসের অনুসরণেই উপস্থাপিত হয়েছে। এছাড়াও ফারুক ও অন্যান্য অনৈতিহাসিক চরিত্রগুলিও নাটকটির ঐতিহাসিক পরিণতিতে সম্পূরক ভূমিকা রেখেছে।

তৃতীয় পক্ষের অজ্ঞাত ষড়যন্ত্রের শিকার কবি ও সুলতানের মধ্যকার সংঘাতের যে নিরর্থকতা, নাট্যকার শেষ দৃশ্যসহ বিভিন্ন দৃশ্যে একাধিকবার সেই মূল প্রসঙ্গটিকে তুলে ধরেছেন। পূর্বে নাটকের ষষ্ঠ দৃশ্যে যেমন সুলতান ও উজিরের সংলাপে অতীত-বীক্ষণকে ব্যবহার করেছেন আবদুল হক, একইভাবে অষ্টম দৃশ্যেও কবি ও ফারুকের আলাপচারিতায় ব্যবহৃত হয়েছে অতীত রোমন্থন। প্রত্যক্ষ প্রমাণের মাধ্যমে কবি ও সুলতানের 'অজানিত-ভ্রান্তির' অবসানের কোনো চিত্র তিনি নির্মাণ করেননি। কিন্তু সাত বছরেরও অধিক কালব্যাপী ক্রমপরিণত দুটি চরিত্রই অতীতচারী আত্মবোধনের প্রক্রিয়ায় এই বিষময় সংঘাতকে নিয়ে যে পীড়িত ও ভাবিত হয়েছেন এবং ক্ষমার শক্তিতে তা অতিক্রম করতে চেয়েছেন তাঁর ইঙ্গিত মেলে নাটকের একাধিক দৃশ্যে।

ফেরদৌসী নাটকটি রচনার নেপথ্যে রয়েছে আবদুল হকের দীর্ঘ পঠন। প্রতিষ্ঠিত ঐতিহাসিক সূত্র ও প্রচলিত ইতিহাসভিত্তিক লোকশ্রুতি ব্যবহার করে নাট্যকার নির্মাণ করেছেন ফেরদৌসীর জীবনের অন্তিম অধ্যায়। উৎসের ক্ষেত্রে তাঁর নির্ভরতা মূলত ই. জি. ব্রাউনের ইতিহাস গ্রন্থে উদ্ধৃত নিযামী আরুযীর *তাযকেরায়ে চাহার মাকালে*'র ইতিহাস সূত্রের প্রতি বলে প্রতীয়মান হয়। তবে ক্ষেত্রবিশেষে তিনি সম্ভবত ইবন ইস্ফান্দিয়ারের *তারিখ-ই-তাবারিস্তান* ও লোকশ্রুতি প্রধান ইতিহাস সূত্র দৌলত শাহ-এর কবিজীবনী গ্রন্থ *তাযকিরাতুশ শোয়ারা* থেকেও উপাদান আহরণ করেছেন। প্রধান-অপ্রধান, ঐতিহাসিক-অনৈতিহাসিক চরিত্র, বাস্তব-কল্পনার, ইতিহাস ও কিংবদন্তির বিচিত্র সমাবেশে নাট্যকার শেষ অবধি ফেরদৌসী ও সুলতান মাহমুদের দ্বান্দ্বিক-সম্পর্কের নেপথ্যের ঘৃণা-ক্ষমার দর্শনকেই শিল্পসম্মতভাবে তুলে ধরেন। এমনকি মৃত্যুর পরে যুক্তিবাদী কবিকে কেন্দ্র করে গোঁড়া মুসল্লিদের বিতর্কের চলমানতা নাট্যকারের ইতিহাস অনুগামিতার সাক্ষ্য বহন করে। আবদুল হক সচেতনভাবেই তাঁর সমসময়ের নাট্যরীতির প্রচল ও জনপ্রিয় লঘুতাকে এড়িয়ে, সাহিত্যমূল্য-সম্পন্ন নাটক লেখার প্রয়াস নিয়েছিলেন, ফলে এই নাটকের ট্র্যাজিক পরিণতি গতানুগতিক করুণ-রসের বাহুল্যপূর্ণ মেলোড্রামায় পর্যবসিত হয়নি। এছাড়া ইতিহাসকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে আনুগত্যের প্রয়োজনে শেষ দৃশ্যটিতে একাধিক প্রসঙ্গের সমাপ্তি টানতে গিয়ে নাট্যবিন্যাসে কিছুটা সীমাবদ্ধতা পরিলক্ষিত হলেও, পূর্বাপর নাট্যগতি অক্ষুণ্ণ রেখেছেন তিনি। নাট্যিক প্রয়োজনে শিল্পিত-কল্পনা যুক্ত হলেও নাট্যপরিণামের ক্ষেত্রে আবদুল হক মূলত ঐতিহাসিক তথ্যের নিকট-অনুগামী। ইতিহাসভিত্তিক নাটকটির নির্মাণে আবদুল হক প্রচলিত ইতিহাসসূত্রের আলোকেই ফেরদৌসী চরিত্রের অন্তিম পরিণতির পরিকল্পনা করেছেন এবং ঐতিহাসিক–অনৈতিহাসিক চরিত্রের সম্পূরক ভূমিকায় এই পরিণতি শৈল্পিক সিদ্ধি লাভ করেছে।

যুগ-আবহ বা মিলিউ

ঐতিহাসিক নাটকে যে যুগ ও কালের প্রেক্ষাপট ব্যবহৃত হয়, তার সঠিক পরিচয় নির্মাণের প্রয়োজনে নাট্যকারকে সচেতনভাবে নির্মাণ করতে হয় সেই যুগের আবহ বা মিলিউ-কে। যুগের চল ও বাস্তবতাকে প্রতিষ্ঠা করবার জন্য সেই সময়ের জীবনাচার, ভাষা-সমাজ-সংস্কৃতি, বিবিধ প্রথা, আচার-বিচার-সংস্কার, জীবনাদর্শ প্রভৃতিকে যতদূর সম্ভব বাস্তবতার সাথে তুলে ধরতে হয়। যেমন এই নাটকে সুলতানের সঙ্গে ফেরদৌসীর সম্পর্ক, দরবারী সম্ভাষণ, নজরানা প্রদান, কাসিদা রচনার চল, ইনাম

হিসেবে স্বর্ণ দিনারের উল্লেখ, সুলতানের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের প্রতিবাদে ব্যঙ্গ-কবিতা রচনা, তার বিনিময়ে কঠোর দণ্ডপ্রাপ্তি– এর প্রতিটি তৎকালীন সমাজের রীতি, রাজসভার সংস্কৃতি, রাজদণ্ডের কঠোরতা প্রভৃতিকে তুলে ধরে।

নাটকের সূচনাতেই আবদুল হক নাটকটির সময়কাল ১০১০-১৮ খ্রিস্টাব্দ এবং স্থান হিসেবে গজনী নগরী, হেরাত, গজনী রাজ্য সীমান্ত এবং তুস নগরীকে সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করেন যা *শাহনামা* রচনার পরবর্তীকালের ঘটনা ও ভৌগোলিক প্রেক্ষাপট হিসেবে ইতিহাসসম্মত। বিভিন্ন দৃশ্যে নাট্যকার সুকৌশলে সুলতান মাহমুদ ও তাঁর বাল্যবন্ধু উজির মায়মন্দী ও অন্যান্য চরিত্রের সংলাপের মাধ্যমে প্রাসঙ্গিক ঐতিহাসিক অঞ্চলগুলোকে প্রতিষ্ঠিত করেন। যেমন :

> মাহমুদ : খোরাসানের বিলিয়ামী উপজাতির ষড়যন্ত্র যে আপনি অঙ্কুরেই বিনাশ করতে পেরেছেন এতে আমি খুশী হয়েছি। (আবদুল, ১৯৭৫ : ৩)
> মায়মন্দি : ...কিন্তু খবর পেয়েছি ফেরদৌসী উধাও। গজনীর কোথাও তাঁকে পাওয়া যাচ্ছে না। (আবদুল, ১৯৭৫ : ৩০)
> জামশেদ : এই হেরাত শহরেও সে কবিতা এসে পৌঁচেছে নিশ্চয়। (আবদুল, ১৯৭৫ : ৩৬)
> ফেরদৌসী : তোমার লোক তো কই তুস থেকে ফিরে এলো না। (আবদুল, ১৯৭৫ : ৪৩)

এভাবেই পুরো নাটক জুড়ে প্রতিটি দৃশ্যে পটভূমি হিসেবে অথবা সংলাপে বিভিন্ন স্থান এর প্রাসঙ্গিক উল্লেখ রয়েছে, যা এই নাটকটির ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ও স্থান নির্দেশনা, সুলতান মাহমুদের আমলের রাজনৈতিক ও ভৌগোলিক সীমারেখা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা দেয়।

সেই সময়ে গ্রন্থচর্চাকেন্দ্রিক সংস্কৃতির একাধিক নিদর্শন মেলে এই নাটকে। সূচনাতে গজনীতে সুলতান মাহমুদের পাঠাগারের উল্লেখ ছাড়াও রাজদরবারে সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতার অনুকূল আবহকে প্রতিষ্ঠা করা হয়। নাট্যকার প্রথম দৃশ্যে কাসিদা রচনা ও পাঠের জনপ্রিয়তাকে তুলে ধরেছেন এবং কাসিদাকে কেন্দ্র করে নাট্যদ্বন্দ্ব নির্মাণ করেছেন। প্রথম দৃশ্যেই সুলতানকে কবির 'স্তুতিমূলক কাসিদা' নজরানা দেওয়ার দৃষ্টান্ত এবং আয়াজ ও আমীর হাজিব এর 'যুদ্ধগাথা জাতীয় কাসিদা'য় অর্ন্তভুক্ত হবার আগ্রহ উপস্থাপনের মাধ্যমে সে আমলের এই বিশেষ কাব্যরীতির দরবারী অবস্থান ও জনপ্রিয়তাকে তুলে ধরা হয়। যুগের দরবারী সংস্কৃতির বাস্তবতার যথাযথ পরিচয় তুলে ধরবার উদ্দেশ্যে নাট্যকার দ্বিতীয় দৃশ্যে উৎফুল ফেরদৌসীর বরণমালা প্রাপ্তিসূত্রে সেই সময়কার তিনজন গুরুত্বপূর্ণ কবি আসজাদি (মৃ. ১০৪০ খ্রি), ফররুখী সিস্তানী (মৃ. ১০৩৭ খ্রি.) উনসুরীর (মৃ. ১০৪০ খ্রি.) এবং তৃতীয় দৃশ্যে মানুচেহরী দামগানী (মৃ. ১০৩১)র কথা উল্লেখ করেন। এঁরা ফেরদৌসীর সমসময়ের এবং মহাপণ্ডিত আল-বেরুনী (মৃ. ১০৪০ খ্রি.)-র সাথে সকলেই সুলতান মাহমুদের সভায় সসম্মানে স্থান পেয়েছিলেন। তথ্যটির ঐতিহাসিক সত্যতা সম্পর্কে মনিরউদ্দিন ইউসুফ জানান, "...সুলতান মাহমুদের রাজসভাগুণীজন দ্বারা অলংকৃত ছিল। মহাপণ্ডিত আল-বেরুনী

ছিলেন সুলতানের সভার মহত্তম মণি, আস্‌জাদী, ফররুখী, উনসুরী নামে আরো কয়েকজন কবিও সুলতানের সভা আলোকিত করে রেখেছিলেন।"(মনিরউদ্দিন, ২০১২ : ভূমিকাংশ পৃ. ৩)

চতুর্থ দৃশ্যে কুতুবখানার মালিক মা'আলীর সংলাপে '*কামিলুস-সালা-আত*','*কিতাবুল আগানী*' ও '*শাহনামা*'র (আবদুল, ১৯৭৫ : ৩৪) উল্লেখসূত্রে ওই সময়ের জনপ্রিয় কাব্যগ্রন্থের পাঠক-চাহিদা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। এই দৃশ্যেই আবদুল হকের বিস্তৃত নাট্য-নির্দেশনায় সেই সময়ের কুতুবখানা-কেন্দ্রিক সাংস্কৃতিক বাস্তবতার বিশদ পরিচয় মেলে–

> ... হেরাত শহরের এক কুতুবখানা। ঘরের দেওয়াল জুড়ে কয়েকটি তাক, সে-সব তাকে থরে থরে পুঁথি সাজানো। ... এটি পুস্তকালয় ও শয়নগৃহ উভয়ই। অন্যান্য আসবাব দেখে বোঝা যায় মালিক সচ্ছল নয়। কুতুবখানার মালিকের নাম আবুল মা'আলী। তাঁর পেশা কেতাব বিক্রি করা একালের মতো মুদ্রিত কেতাব নয়, হস্তলিখিত পুঁথি। কবিদের উপযুক্ত দক্ষিণা দিয়ে তাঁদের কাব্য নকল করে আনেন, তারপর কাতিবকে দিয়ে সেসব কাব্যের প্রতিলিপি প্রস্তুত করে রাখেন। এই প্রতিলিপিগুলোই তাঁর সম্পদ। (আবদুল, ১৯৭৫ : ৩৩)

এছাড়াও সে আমলে পাণ্ডুলিপি লেখক বা কাতিবদের যে গুরুত্ব ছিল তা এই নাটকে বহু প্রসঙ্গে উচ্চারিত। নাট্যকার প্রথম দৃশ্যে ফেরদৌসীর কাতিব আবু দাইলাম এবং চতুর্থ দৃশ্যে কুতুবখানার মালিক মা'আলীর কাতিব আগা মিনহাজ চরিত্র দুটির মাধ্যমে তৎকালের গ্রন্থ রচনার সংস্কৃতির একটি পরিচয় দেন যেখানে কাতিবদের ভূমিকা অনস্বীকার্য। এদের মধ্যে আবু দাইলাম চরিত্রটি বাস্তবে কবির লিখিয়ে আবু দেইলামের অনুসারে পরিকল্পিত। (ব্রাউন, ১৯০৬ : ১৩৩)

ফেরদৌসী নাটকের প্রতিটি দৃশ্যের শুরুতে বন্ধনীতে লেখা নাট্যকারের নির্দেশনা ও তথ্য প্রদান, নাটকটির ঐতিহাসিক পটভূমি, ঘটনাপ্রবাহের বাস্তবতা ও গতিময়তা, চরিত্রসমূহের বিশ্বাসযোগ্যতাকে প্রতিষ্ঠিত করা ছাড়াও ইতিহাস চেতনাকে সফলভাবে সংগ্রথিত করতে সক্ষম হয়েছে। অত্যন্ত অনুপুঙ্খ বর্ণনায় আবদুল হক ইতিহাসভিত্তিক নাটক হিসেবে এর আবহ-নির্মাণ ও স্থান-কালের প্রাসঙ্গিকতা সুচারুভাবে রক্ষা করেছেন।

ভাষা ও সংলাপ

ফেরদৌসী নাটকের অন্যতম সম্পদ এর ভাষা ও সংলাপ। ঐতিহাসিক নাটকের ভাবগাম্ভীর্য বজায় রেখেও এ নাটকের সংলাপ অত্যন্ত প্রাঞ্জল এবং কৃত্রিমতা-বর্জিত। প্রতিটি চরিত্রের মুখেই পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তিতে, তাদের যার যার শ্রেণি অবস্থান, আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট ও পেশা-উপযোগী ভাষা দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও সাধারণ নাট্য-সংলাপের পাশাপাশি, স্থানে স্থানে *শাহনামা* থেকে উদ্ধৃতি ছাড়াও কবিতা, বয়েত,

এমনকি ছন্দোবদ্ধ লোকপ্রবাদের অনুবাদও ব্যবহৃত হয়েছে। ফলে বৈচিত্র্যপূর্ণ ভাষারীতির উপস্থাপনে নাটকটি কোনো দৃশ্যেই একমাত্রিক হয়ে পড়েনি। পারস্যের রাজ্-দরবার ও শ্রেষ্ঠ মহাকবি ফেরদৌসীর জীবনকে ফুটিয়ে তুলতে নাট্যকার বাংলার সাথে যথাযথ মিশেল ঘটিয়ে, একটি ফারসি-প্রধান ভাষার কুশলী ব্যবহার করেছেন যা এই নাটককে একটি বিশেষ চরিত্র ও আবহ দিয়েছে। বিশেষত দরবারি বা রাজভাষা হিসেবে ফারসি যে আভিজাত্য ও মর্যাদাসম্পন্ন, তা দেখাতে গিয়ে নাট্যকার প্রধানত দরবার বা সুলতান-কেন্দ্রিক দৃশ্যে ফারসির অধিকতর ব্যবহার দেখিয়েছেন। অপরাপর দৃশ্যগুলিতে প্রয়োজন অনুযায়ী এর প্রয়োগ ঘটলেও, সার্বিকভাবে নির্ভরতা কম। যেমন:

> ফেরদৌসীর সংলাপ : "জাহাঁপনার মকসেদ হাসিল হোক। আমি শাহানশার জন্য একটা নজরানা এনেছিলাম।
> একটা কাসিদা। জাহাঁপনার অনুমতি পেলেই পেশ করবো।" (আবদুল, ১৯৭৫ : ০৯)
> আয়াজ এর সংলাপ : "এই দিনারের জন্য কতদূর দেশের জঙ্গের ময়দানে হাজার হাজার বীর শহীদান জান কোরবান করেছে।" (আবদুল, ১৯৭৫ : ১৩)
> কাতিবের সংলাপ : "মিনহাজ। খোদার কসম, কাজে আমি একটুও গাফিলতি করিনি।" (আবদুল, ১৯৭৫ : ৩৪)
> চাকরের সংলাপ : "খানা তৈরি হইছে।" (আবদুল, ১৯৭৫ : ২২)
> খায়রুজান এর সংলাপ : মেয়ে যদি আসে ঘরে/ খুব জলদি দিও বরে/ খুঁজে যদি না পাও বর/ তবে তাকে দাও কবর। (আবদুল, ১৯৭৫ : ৭৬)

লক্ষণীয়, নাট্যকার প্রথম থেকে শেষ দৃশ্য পর্যন্ত নাটকে কবিতা বা কবিতাংশের একাধিক ব্যবহার করেছেন, কিন্তু বাহুল্য হিসেবে নয়, বরং প্রতিটি প্রয়োগ ঘটেছে নাট্যদৃশ্য নির্মাণের প্রয়োজনে। এ প্রসঙ্গে নাট্যকার নাটকের ভূমিকাংশেই উল্লেখ করেন– "এ নাটকে ছন্দোবদ্ধ কোনো রচনা বা পংক্তিই মৌলিক নয়, অনুবাদ। আমি একসময় ফারসী পড়েছিলাম, কিন্তু এ-নাটকের যাবতীয় কবিতা, কবিতাংশ, পংক্তি এবং প্রবাদ অনুবাদ করেছি ইংরেজী থেকে। এক সময় কবিতা লিখতাম বলে নিজেই কাব্যানুবাদে সাহসী হয়েছি।" (আবদুল, ১৯৭৫ : গ)

নাটকে ব্যবহৃত প্রায় শতাধিক ফারসি এবং কিছু আরবি শব্দের যুৎসই প্রয়োগ এ নাটকটির বিশেষ সম্পদ। এ নাটকে বহুল ব্যবহৃত এবং সফল প্রয়োগকৃত ফারসি শব্দের মধ্যে রয়েছে : গালিচা, মসনদ, সিপাহ্সালার, কেতাব, আমির, শাহানশা, বাগিচা, ফৌজ, জখমী, কাসিদা, কাতিব, কুতুবখানা, নকল, নজরানা, মোলাকাত, জঙ্গ, ময়দান, শহীদান, জান কোরবান, নেক-নজর, গোলাম, না-খোশ, পেয়ারা, দিদার, মোকসেদ, হাসিল, পেশ, তাজ, খাসলত, মতলব, মুনাজাত, নসিব, নিশানা, হাসিল, জাহাঁপানা, ইনাম, খাজাঞ্চি, দিনার, দিরহাম, দরবার, তামামশোদ, বয়েত, হুকুমনামা, মেহেরবান, খুদাওন্দ, এবাদত-বন্দেগী, হাম্মাম, শরবৎ, ফকির-মিসকিন, সবুর, ময়দান, মোতাজেলা, রসিদ, বখশিস, দস্তখত, ইনাম, পরোয়ানা, কোশেশ, কসুর, কতল, গাফলতি, কিস্তি, মুসাফির, পেরেশান, লায়েক, মউত, বেইনসাফী, ঝুট, দফতর,

বেওয়া, মাসুম, আর্জি, আরজ, ইনসাফ, শাহী-তখত, জেব, তলোয়ার, গোস্তাকী, দাওয়াত, বেহায়া, জবরদস্ত, মালিক, শাদী, দুলহা, মুল্লুক, কাহিল, মোশায়েরা, মওকা, বেহুঁশ, ইন্তেকাল, পাওনা, মশহুর, নেয়ামত আফশোস, দৌলত, মারহাবা ইত্যাদি।

উপসংহার

বর্তমান আলোচনার উপান্তে এসে বলা চলে ঐতিহাসিক চরিতনাটক রচনার শৈল্পিক অভিপ্রায় প্রসঙ্গে আবদুল হক শুরু থেকেই নিশ্চিত ছিলেন। ফলে ইতিহাসের বহুল পরিচিত কাহিনির মূলানুগ থাকবার সিদ্ধান্ত নিয়েই তিনি নাটকটি রচনার কাজে হাত দেন এবং কোনো গুরুতর বিচ্যুতি ব্যতিরেকেই নাট্য-কাহিনির সমন্বয় ঘটান। এ নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্রসহ সহচরিত্রের অনেকগুলোই ইতিহাসসম্মত। যে কটি অনৈতিকহাসিক চরিত্রের উপস্থিতি আছে, সেগুলোও যুগসত্যকে স্বীকার করে নাট্যাখ্যানের প্রয়োজনে শিল্পসম্পূরক হয়ে পরিকল্পিত হয়েছে। এছাড়াও মহাকবি ফেরদৌসীর জীবনের বহুশ্রুত ইতিহাস থেকে নির্বাচিত ঘটনা নিয়ে তারই শিল্পরূপ দিয়েছেন নাট্যকার। ক্ষেত্রবিশেষে কল্পনার আশ্রয় নিলেও তা কোনো ক্রমেই মূল ঐতিহাসিক সত্য থেকে বিচ্যুত হয়নি। নাট্যকার আবদুল হক সেই সময়ের ঐতিহাসিক বাস্তবতাকে তুলে ধরবার জন্য বিশেষভাবে মনোযোগী ছিলেন ভাষা-সংলাপ এর ব্যবহার, অনুপুঙ্খ দৃশ্যনির্দেশনা ও যথাযথ যুগাবহ পরিকল্পনা বিষয়ে। প্রতিটি ক্ষেত্রেই তাঁর গবেষণামুখী অভিনিবেশ নাটকটির পূর্বাপর ইতিহাস-নিষ্ঠাকে নিশ্চিত করেছে। বিশেষ করে আত্মসম্মানী কবি ফেরদৌসীর প্রতিবাদী সত্তাকে তিনি সফলভাবেই বিশ্বাসযোগ্য করে তুলেছেন ঐতিহাসিক চরিতনাটক ধারার এই পূর্ণাঙ্গ নাট্যাখ্যানে।

টীকা

১. আবদুল হকের প্রকাশিত প্রথম গ্রন্থটি পাঁচ অঙ্ক বিভক্ত একটি পূর্ণাঙ্গ সামাজিক নাটক। ১৯৫৬ সালে প্রকাশিত *অদ্বিতীয়া* নাটকের মাধ্যমে নাট্যকার হিসেবে আত্ম-প্রকাশ ঘটে তাঁর। এযাবৎকাল তাঁর প্রকাশিত মৌলিক নাটক/নাটিকার সংখ্যা নয়টি। এছাড়াও রয়েছে বাংলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত সাতটি অনুবাদ নাটকসহ মোট আটটি অনুবাদ নাটক আর একাধিক অসম্পাদিত ও অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি। ঐতিহাসিক নাটকের ধারায় রয়েছে তাঁর রচিত কিশোর উপযোগী নাটিকা *সুলতানের বিচার* (১৯৫৮)। এছাড়াও ০৮ মার্চ ১৯৬৩এর দিনলিপিতে উল্লেখ রয়েছে যে, ঐতিহাসিক চরিত্র সুলতানা রিজিয়া সম্বন্ধে আরও একটি গবেষণাধর্মী নাটক লেখার পরিকল্পনা ছিল তাঁর।

২. মুহাম্মদ আওফী *লুবাবুল আলবাব* গ্রন্থে দাকিকী রচিত বয়েতের সংখ্যা বিশ হাজার উল্লেখ করলেও ফেরদৌসী তাঁর রচনায় এক হাজার সংখ্যক বয়েতের উল্লেখ করেছেন। (ব্রাউন, ১৯০৬ : ১৩০)

৩. হামাসে মহাকাব্য বা বীরত্ব গাথা (Epic) সাহসিকতা ও বীরত্বমূলক রচনার নাম, যার মধ্য দিয়ে জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটে। ইতিহাস, বাস্তবতা, রূপকথা, কিংবদন্তি ও কল্পনার সমন্বয়ে রচিত মহাকাব্যে কবি হয়ে ওঠেন জাতির ইতিহাস রচয়িতা। এই রীতির শ্রেষ্ঠ কবিদের মধ্যে রয়েছেন ফেরদৌসী ও আসাদী তুসী। (তামিমদারী ২০০৭ : ১২১-১২৩)

৪. অধ্যাপক ই.জি. ব্রাউন তাঁর আকর গ্রন্থ *A Literary History of Persia* (১৯০৬)তে একাধিক লেখকের উল্লেখযোগ্য রচনাকে নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক সূত্র হিসেবে ব্যবহার করেছেন, যার মধ্যে প্রথমেই রয়েছে স্বয়ং কবি ফেরদৌসী রচিত অমরগ্রন্থ *শাহনামা*। তাঁর অভিমতে গজনী শাসন আমল, কবি ফেরদৌসী ও পারস্যের অন্য উল্লেখযোগ্য কবিদের জীবনী ও রচনা সংক্রান্ত ইতিহাসনিষ্ঠ সূত্রের মধ্যে রয়েছে : ১. মুহাম্মদ আওফী কর্তৃক ৭ম শতাব্দীতে রচিত *লুবাবুল আলবাব* নামক ১৫০ জন কবির জীবনীভিত্তিক অতিসংক্ষিপ্ত বিবরণধর্মী গ্রন্থ এবং ২. নিযামী আরুযী (জ. আনু. ৬ষ্ঠ হি./১১ খ্রি.) রচিত বিস্তারিত তথ্যভিত্তিক *তাযকেরায়ে চাহার মাকালে* (১১৫৫ খ্রি.), যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ইতিহাসসূত্র হিসেবে বিবেচিত। ব্রাউন উল্লেখিত অন্য দুটি ঐতিহাসিক সূত্রের মধ্যে রয়েছে : ৩. দৌলত শাহ সামারকান্দী (জ. ৮৪২/১৪৩৮) কর্তৃক নবম শতাব্দীতে রচিত *তাযকিরাতুশ শোয়ারা* (কবিদের স্মরণিকা) (৮৯২/১৪৮৬) যা ইতিহাসের তথ্যের অতিরেক বহু লোকশ্রুতি ও কিংবদন্তির মিশেল এবং ৪. ইব্‌ন ইস্ফান্দিয়ার কর্তৃক তেরো শতকে রচিত *তারিখ-ই-তাবারিস্তান* (৬১৩/১২১৬-১৭) যা সেই সময়ের ইতিহাস ও লোকশ্রুতির সংমিশ্রণ বলেই অনুমিত হয়।

৫. ইংরেজি অনুবাদে মূল চরণ দুটি ছিলো নিম্নরূপ : “Thy gaze the Creator can never descry Then wherefore by gazing dost weary thine eye?” (ব্রাউন, ১৯০৬ : ১৩৪)

৬. আরবী রাফিদা শব্দটির উর্দু ও ফার্সিরূপ রাফেযী, যা শিয়াপন্থি মুসলিমদের প্রতি অবজ্ঞাপ্রকাশকারী অভিধা হিসেবে ব্যবহৃত। এর আক্ষরিক অর্থ ‘প্রত্যাখ্যানকারী। হযরত আবু বকর, হযরত ওমর ও হযরত ওসমানকে হযরত মুহম্মদ (সা.) এর যথার্থ উত্তরসূরী হিসেবে প্রত্যাখানসূত্রে শিয়াপন্থিদের এই নাম দেয়া হয়। “কবিদের মধ্যে সম্ভবত ফেরদৌসী অল্লাহর দর্শন সম্ভব নয় সম্পর্কিত মু’তাযেলা মাযহাবের মূল নীতিকে সমর্থন করতেন।” (তামিমদারী, ২০০৭ : ৩৭)

৭. মু’তাযেলা অষ্টম থেকে দশম শতাব্দীর ইসলামিক চিন্তা ও দর্শনের একটি বিশিষ্ট যুক্তিবাদী ধারা যারা ঐশ্বরিক নির্দেশের অন্ধ অনুসরণের পরিবর্তে যুক্তি ও বিশ্লেষণকে গুরুত্ব প্রদান করত। প্রথাগত ধর্মীয় অনুশাসনের বিরোধিতা ও অতিযুক্তিবাদী অবস্থান মু’তাযেলীদের বিতর্কিত করে তোলে। হিজরি দ্বিতীয় শতকের প্রথমার্ধে বসরা’য় মু’তাযেলা সম্প্রদায়ের উৎপত্তি ঘটে। (তামিমদারী, ২০০৭ : ৩৭) মু’তাযেলী প্রতিপন্ন করবার জন্য প্রমাণ হিসেবে সুলতানের সামনে ফেরদৌসী রচিত পঙক্তি ব্যবহার করা হয় : ‘দুই চোখে দেখবেনা তুমি স্রষ্টাকে/ কষ্ট দিওনা অযথা দুই চোখকে।’ (তামিমদারী, ২০০৭ : ১৩০)

৮. ‘অপবাদসূচক এই কবিতায় ফেরদৌসী এমন কয়েকটি কথা বলেছেন, যা দিয়ে আমরা সুলতানের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক, ‘শাহনামা’ রচনা শেষ করার সময় কবির আয়ুষ্কাল, দু’চারটি শ্লোকে শাহনামার বিষয়বস্তুর পরিধি, ফেরদৌসীর শিয়া মতবাদ, পারিতোষিক দানের সময় বিবেচিত হওয়ার বিষয় ও সর্বোপরি ‘শাহনামা’কে সর্বযুগের একটি মহৎ কাব্যকীর্তি হিসাবে ছেড়ে যাওয়ার প্রত্যয় আর সেই সঙ্গে কবির আত্মমর্যাদাবোধ ইত্যাদি বহু বিষয় জানতে পারি। ...কবি বস্তুত তাঁর আশানুরূপ পারিতোষিক না পাওয়ায় যে ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন, তারই প্রতিক্রিয়ায় সুলতানের দিক থেকে কবির ওপর বর্ষিত হয়েছিল তিরস্কার এবং তার ফলই কবির আত্মমর্যাদাবোধকে আহত করেছিল। সুলতানের নিন্দাসূচক এই কবিতাটি কবির সেই প্রতিক্রিয়াকেই প্রকাশ করছে।’ (মনিরউদ্দিন, ২০১২ : ভূমিকা -১০)

৯. কবিতাটি ছিলো, ‘যদি জবাব আমার সন্তোষজনক না হয়/ আমি আছি আর আছে গদা, রণাঙ্গন ও আফরাসিয়াব।’ (তামিমদারী, ২০০৭ : ১৩১)

১০. কাসিদা ইসলামপূর্ব আরবে উদ্ভূত বিশেষ একটি কবিতার ধারা যা ইসলামিক সাহিত্যের পুরো সময় জুড়ে চর্চিত ও বিকশিত হয়ে বর্তমান সময় পর্যন্ত বিদ্যমান। এর পংক্তি সংখ্যা ৬০ থেকে ১০০ লাইন, মতান্তরে ২০ থেকে ১৭০ শ্লোক পর্যন্ত হতে পারে। কাসিদা শব্দের অর্থ : “যার জন্য ইচ্ছা করা হয়েছে এবং অভীষ্ট লক্ষ্য।” (তামীমদারী, ২০০৭ : ১৫৪) ফার্সী পরিভাষায় মূলত প্রশংসা-স্তুতি জাতীয় বিশেষ উদ্দেশ্য বিশিষ্ট কবিতাকে কাসিদা বলা হয়। আরব ও পারস্য দেশে এটি একটি প্রশংসাসূচক, শোকপ্রকাশকারী কিংবা ব্যঙ্গাত্মক কবিতারীতি হিসেবে সমাদৃত। তবে এর বিষয়বস্তু আরও বিচিত্রধর্মী। যেমন : “প্রশংসা, উপদেশ, হেকমত, অভিনন্দন, শোকবার্তা, অভিযোগ, গুণবর্ণনা, বিজয়গাথা ও মদমত্ততা প্রভৃতি।

১১. দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় আবদুল হক জানান : “ফেরদৌসীর ভগ্নী এবং কন্যা ঐতিহাসিক চরিত্র, কিন্তু তাদের নাম আমি কোথাও পাইনি, অতএব নাম দুটি কাল্পনিক।” (আবদুল, ১৯৭৫ : ঘ)

১২. ‘ষাট হাজার স্বর্ণমুদ্রার কাহিনীটি সম্ভবত একটি কাহিনীই।’ (মনিরউদ্দিন, ২০১২ : ভূমিকা -১০)

১৩. দৌলত শাহ-এর বিবরণে ফেরদৌসীর দাফনে বাধা প্রদানকারী ব্যক্তির নাম শাইখ আবুল কাশিম আল জুরজানি, এবং কবির শেষকৃত্যে বাধা প্রদানের নেপথ্যের কারণ কবির শিয়াপন্থি পরিচয় ও কাব্যে অমুসলিম বীরদের প্রাধান্য দান। (ব্রাউন, ১৯০৬ : ১৩৮)

আকর গ্রন্থ

আবদুল হক (১৯৭৫)। ফেরদৌসী। বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

গ্রন্থপঞ্জি

অজিতকুমার ঘোষ (১৯৯৯)। *বাংলা নাটকের ইতিহাস*। জেনারেল প্রিন্টার্স এন্ড পাবলিশার্স লিমিটেড, কলিকাতা।

আবদুল হক (২০১৭)। *আমার জীবন কথা : স্মৃতিকথা ও দিনলিপি*। আহমদ মাযহার (সম্পা.)। কথাপ্রকাশ, ঢাকা।

আহমাদ তামিমদারী (২০০৭)। *ফার্সি সাহিত্যের ইতিহাস*। অনুবাদ : তারিক জিয়াউর রহমান সিরাজী ও মুহাম্মদ ঈশা শাহেদী। আল হুদা আন্তর্জাতিক প্রকাশনা সংস্থা. ঢাকা।

আহমাদ মাযহার (২০০১)। *আবদুল হক*। বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

দুর্গাশংকর মুখোপাধ্যায় (২০০৩) । *নাট্যতত্ত্ব বিচার*। করুণা প্রকাশনী, কলকাতা।

ফেরদৌসী (২০১২)। *শাহানামা*। অনুবাদ মনিরউদ্দিন ইউসুফ। বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন (১৯৭৬)। *ইরানের কবি*। বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

রামেন্দু মজুমদার (সম্পা.) (২০১৩)। *নাট্য-পরিক্রমা চার দশকের বাংলাদেশ*। নবযুগ প্রকাশনী। ঢাকা।

সত্যবতী গিরি ও ড. সমরেশ মজুমদার (সম্পা.) (১৯৯৭)। *প্রবন্ধ সঞ্চয়ন*। রত্নাবলী, কলকাতা।

সৈয়দ আজিজুল হক (সম্পা.) (২০০৩)। আবদুল হক : স্মৃতি-সঞ্চয় ১। সময় প্রকাশন, ঢাকা।

ইংরেজি গ্রন্থ

E. G. Brown (1906)। *A Literary History of Persia*। T. Fisher Unwin, Ltd, London.

প্রবন্ধপঞ্জি

বিশ্বজিৎ ঘোষ, ‘বাংলাদেশের পঁচিশ বছরের নাট্য সাহিত্যের ধারা (১৯৭১-১৯৯৫)’। রামেন্দু মজুমদার (সম্পা.) (২০১৩)। *নাট্য-পরিক্রমা চার দশকের বাংলাদেশ*। নবযুগ প্রকাশনী। ঢাকা।

সৌমিত্র বসু, ‘বাংলা ঐতিহাসিক নাটক’। ড. সত্যবতী গিরি ও ড. সমরেশ মজুমদার (সম্পা.), (১৯৯৭)। *প্রবন্ধ সঞ্চয়ন*। রত্নাবলী, কলকাতা।